গল্পাঞ্জলি

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক প্রবর্তিত নূতন সিলেবাস অনুযায়ী পঞ্চম শ্রেণীর জন্য লিখিত

গল্পাঞ্জলি

(পঞ্চম শ্রেণীর দ্রুত-পঠন)

[পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত নূতন সংস্করণ]

শ্রীগৌরদাস অধিকারী, এম. এ., বি. এড.
সহকারী শিক্ষক, জগৎপুর উচ্চ মাধ্যমিক আদর্শ বিদ্যালয়, হাওড়া

শ্রীবিশ্বেশ্বর সাহু, বি. এ. (অনার্স) বি. টি. (ডিপ্-ইন্. ই. এল. টি.)
সহকারী শিক্ষক, গোপীনাথপুর উচ্চ-বিদ্যালয়, মেদিনীপুর
প্রাক্তন শিক্ষক, বরোজ হাইস্কুল, মেদিনীপুর

কুমারজিৎ প্রকাশনী
৭ নবীন কুণ্ডু লেন
কলিকাতা-৭০০০০৯

অপূর্ব গুরুভক্তি

বহুদিন আগেকার কথা। আয়োধধৌম্য নামে এক ঋষি ছিলেন। আরুণি, উপমন্যু ও বেদ নামে তাঁর তিন জন শিষ্য ছিল। তারা শিক্ষা লাভের জন্য গুরু-গৃহে এসেছিল।

আয়োধধৌম্য একজন আদর্শ শিক্ষক ছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল শুধু লেখাপড়া শিখলেই প্রকৃত মানুষ হওয়া যায় না। তাই তিনি তাঁর শিষ্যরা যাতে সব বিষয়ে দক্ষ হয়ে উঠতে পারে সেভাবে শিক্ষা দিতেন।

একদিন আয়োধধৌম্য শুনতে পেলেন যে আল ভেঙ্গে তাঁর ক্ষেতে জল ঢুকছে। তাড়াতাড়ি জলের স্রোত বন্ধ করা দরকার, নয়ত সব শস্য নষ্ট হয়ে যাবে। অনেক চিন্তার পর তিনি তাঁর প্রিয় শিষ্য আরুণিকে বললেন—"বৎস, জমির আল ভেঙে গেছে। ক্ষেতে জল ঢুকে প্রচুর শস্য নষ্ট হচ্ছে। জমিতে যাতে আর জল ঢুকতে না পারে, সেজন্য তুমি তাড়াতাড়ি গিয়ে আল বেঁধে দাও।"

গুরুর আদেশ পেয়ে আরুণি ক্ষেতে গিয়ে মাটি দিয়ে আল বাঁধার চেষ্টা করল। কিন্তু জলের বেগ এত বেশি ছিল যে আল বাঁধা সম্ভব হলনা। তখন সে ভাবল জলস্রোত বন্ধ করতে না পারলে গুরুর আদেশ অমান্য করা হবে। নিরুপায় হয়ে সে নিজেই বাঁধের উপর শুয়ে পড়ে জলস্রোত রোধ করতে লাগল। এতে তার

সূচীপত্র

অনেক কষ্ট হল। সে মনে-মনে গুরুকে ডাকতে লাগল, "হে গুরুদেব, আমাকে শক্তি দাও, যাতে তোমার আদেশ পালন করতে পারি।"

আস্তে আস্তে জলের স্রোত অনেকটা কমে গেল। এদিকে অনেক দেরি হয়ে গেল। আরুণি বাড়ি ফিরছে না। গুরু এতে খুব চিন্তিত হলেন। তিনি শিষ্যদের নিয়ে আরুণিকে ডাকতে লাগলেন, "আরুণি, তুমি কোথায়? তোমাকে দেখতে পাচ্ছিনা কেন? তুমি শীঘ্র ফিরে এস।" একটু দূরেই আরুণি ক্ষেতের আলের ভেতর থেকে উত্তর দিল, গুরুদেব, আমি আলের মধ্যে শুয়ে আছি। আরুণির কথা শুনে গুরুদেব আশ্চর্য হলেন। দু' হাত বাড়িয়ে তিনি জল থেকে আরুণিকে তুলে নিলেন।

গুরুদেব তাকে আশীর্বাদ করে বললেন, "যেহেতু তুমি জলস্রোত বন্ধ করে উঠে এসেছ, সে জন্য আজ থেকে তোমার নাম হবে 'উদ্দালক'। তুমি সর্ব বিদ্যা আয়ত্ত করেছ। দেশময় তোমার নাম ছড়িয়ে পড়বে।"

গুরুর কথা শুনে আরুণির মুখ উজ্জ্বল হল। ধন্য আরুণির গুরুভক্তি! এমন গুরুভক্তির নিদর্শন জগতের ইতিহাসে বিরল।

অনুশীলনী

১। আয়োধধৌম্য কে ছিলেন? তাঁর তিনজন শিষ্যের নাম বল।

২। আরুণি কে ছিল? সে গুরুর কাছ থেকে কি কাজের ভার পায়?

৩। আরুণির গুরুভক্তি সম্বন্ধে কি জান?

৪। আরুণি কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কি আখ্যা লাভ করেছিল?

৫। ডানদিক থেকে শুদ্ধ শব্দ এনে শূন্যস্থান পূরণ কর:

(ক) আয়োধধৌম্য একজন — ছিলেন। (শিক্ষক / মুনি)

(খ) গুরু — জলের স্রোত বন্ধ করতে আদেশ দিলেন। (উপমন্যুকে / আরুণিকে)

(গ) আরুণি যথাসময়ে বাড়ি না ফেরায় গুরুদেব — হলেন। (চিন্তিত / আনন্দিত)

(ঘ) এমন গুরুভক্তির নিদর্শন জগতের ইতিহাসে —। (বেশি / বিরল)

নির্বোধ ব্রাহ্মণ

একদিন এক ব্রাহ্মণ এক ধনী যজমানের বাড়িতে যজ্ঞের নিমন্ত্রণ পেলেন। যজ্ঞ শেষ হলে যজ্ঞের ছাগলছানাটি নিয়ে তিনি বাড়ি ফিরছিলেন।

ছাগলছানাটি অনেকটা পথ হেঁটে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল দেখে ওটার প্রতি ব্রাহ্মণের মায়া হল। তিনি ওটাকে কাঁধে নিয়ে চলতে লাগলেন।

এদিকে ঠিক সেই সময় এক গাছের তলায় বসে গল্প করছিল তিন বন্ধু। ওরা তিন জনেই খুব ধূর্ত। নানা রকম ছল চাতুরী করে লোক ঠকানো ছিল ওদের কাজ। দূর থেকে এক নাদুস-নুদুস ছাগলছানা কাঁধে করে ব্রাহ্মণকে আসতে দেখে ওদের খুব লোভ হল। ওরা সঙ্গে সঙ্গে এক মতলব এটে ফেলল। তারপর কিছু দূরে-দূরে এক-

একটা গাছের তলায় আলাদা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ছাগলছানা কাঁধে করে ব্রাহ্মণ যখন প্রথম ধূর্ত লোকটির কাছে এল, তখন সে বলল, 'প্রণাম ঠাকুর মশাই। কুকুরছানাটিকে কাঁধে নিয়ে আপনি কোথায় চললেন?'

এ কথা শুনে ব্রাহ্মণ খুব বিরক্ত হয়ে বললেন, "এটি কুকুর ছানা নয়, ছাগলছানা।" প্রথম ধূর্ত তবু বলল, 'আপনি একজন পণ্ডিত মানুষ, আপনি একটা অপবিত্র কুকুরকে কাঁধে নিয়েছেন কেন? এমন দৃশ্য কেউ কোন দিন দেখেনি।' ব্রাহ্মণ বিরক্ত হয়ে ধূর্ত লোকটিকে এড়িয়ে জোরে-জোরে হাঁটতে লাগলেন। তিনি ভাবলেন, আচ্ছা পাগলের

পাল্লায় পড়েছি তো। খানিকটা পথ চলার পর দ্বিতীয় ধূর্ত লোকটির সঙ্গে তাঁর দেখা হল। সে বলল, 'আপনি একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, কেন আপনি কুকুরছানাটিকে কাঁধে বয়ে নিয়ে চলেছেন'। এবার ব্রাহ্মণ তার কথা শুনে একটু ঘাবড়ে আড়চোখে নিরীহ পশুটার দিকে তাকালেন। মনে মনে বললেন লোকটার নিশ্চয়ই মাথা খারাপ, ছাগলছানাকে বলে কিনা কুকুরছানা!

আর এক মুহূর্ত ওখানে না দাঁড়িয়ে ব্রাহ্মণ জোরে-জোরে হাঁটতে লাগলেন এবং মাঝে-মাঝে ভাবতে লাগলেন, যজমান সুযোগ বুঝে ঠকিয়ে দেয়নি তো?

এভাবে ইতস্তত করতে করতে তিনি পথ চলতে লাগলেন। গ্রামে ঢুকবার কিছু আগে তৃতীয় ধূর্তের সঙ্গে তাঁর দেখা হল। ব্রাহ্মণকে দেখে সে অনবরত হাসতে লাগলো। সে বলল, 'সকালবেলা একটা নোংরা কুকুর ছানাকে কাঁধে নিয়ে চলেছেন আপনি? আপনার কি কাণ্ডজ্ঞান নেই? এবার শুনে ব্রাহ্মণের সন্দেহ হল। তিন-তিনটে লোক একই কথা বলছে। এক টানে ছাগলছানাটিকে কাঁধ হতে নামিয়ে ভাল করে না দেখেই তিনি ভাবলেন নিশ্চয়ই তাঁর মস্ত ভুল হয়েছে, নইলে সবাই এক কথা বলবে কেন? তিনি তখন ছাগল ছানাটিকে রাস্তায় ফেলে দিয়ে কাছাকাছি একটি পুকুরে স্নান সেরে নিজের বাড়ির দিকে রওনা হলেন। এদিকে ধূর্তেরা ছাগল-ছানাটিকে পেয়ে রান্না করে পরম তৃপ্তিসহকারে খেল।

নিজে ভালভাবে যাচাই না করে অন্যদের কথায় বিশ্বাস করে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছনো ঠিক নয়।

অনুশীলনী

১। ব্রাহ্মণকে কে ছাগলছানা দান করেছিল?

২। ব্রাহ্মণ কিভাবে ছাগলছানাটিকে বয়ে আনছিলেন?

৩। ধূর্তরা কি ষড়যন্ত্র করেছিল?

৪। ব্রাহ্মণ কেন ছাগলছানাটিকে ফেলে দিয়েছিলেন?

৫। ধূর্তরা ছাগলছানাটিকে নিয়ে কি করল? এ গল্প থেকে কি শিক্ষা লাভ করা যায়?

৬। শূন্যস্থান পূরণ কর:

(ক) এক ব্রাহ্মণ — যজমানের বাড়িতে — নিমন্ত্রণ পেলেন।

(খ) — তিনি কাঁধে নিয়ে চলতে লাগলেন।

(গ) পথে — সঙ্গে তিনটি —লোকের দেখা হয়।

(ঘ) ধূর্ত লোকেরা — রান্না করে খেল।

বানরের হৃৎপিণ্ড

অনেক দিন আগের কথা। একটা নদীর ধারে ছিল এক বিশাল বন। সে বনে ছিল প্রকাণ্ড একটা জাম গাছ। জাম গাছে বাস করত এক বানর। বানরটা ছিল খুব চালাক। মনের সুখে সে জাম ফল খেত। জাম ফলগুলি ছিল বেশ বড় আর খুব মিষ্টি।

বানরের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল এক কুমীর। কুমীর কাছাকাছি এক নদীতে বাস করত। নদীর মাঝে চরের মধ্যে ছিল তার বাসা। সে রোজ সেখান থেকে ডুব দিয়ে জাম গাছের গোড়ায় ভেসে উঠত। তারপর ডাঙায় উঠে বন্ধু বানরের সঙ্গে মনের আনন্দে গল্প-গুজব করত আর জাম খেত। সূর্য যখন পশ্চিম আকাশে অস্ত যেত তখন সে বাড়ি
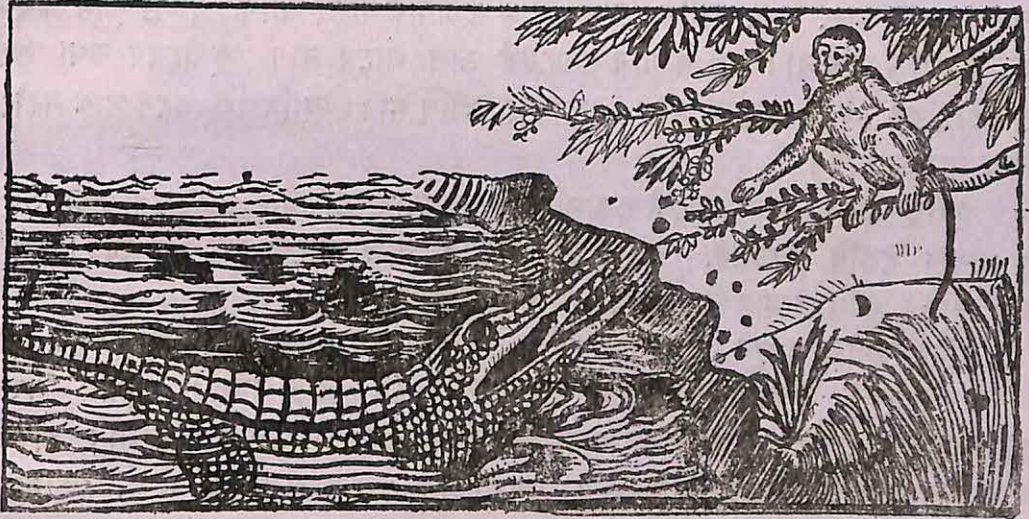
ফিরত। এ ভাবে কুমীর প্রতিদিন যাওয়া-আসা করত। যাবার সময় বানর-বন্ধু তার সঙ্গে কিছু জাম দিয়ে বলত বন্ধু, তোমার বউকে আমার নমস্কার জানিও, আর তাকে আমার সামান্য উপহার দিও।

কুমীরের বউ ছিল খুব লোভী ও ধূর্ত। প্রতিদিন জাম ফল খেয়ে তার লোভ বেড়ে গেল। একদিন সকাল থেকে সে মুখ ভার করে বসে রইল। দুপুর হয়ে গেল, তবু সে খাওয়া-দাওয়া করল না। কারো সঙ্গে কোন কথাও বলল না। কুমীর তাকে অনেক সাধাসাধি করল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। তখন সে ভয় পেয়ে গেল। সে বৌকে অনুনয়-বিনয় করতে লাগল। অবশেষে বৌ মুখ খুলল। সে কুমীরকে বলল, যদি তুমি আমার কথা রাখ, তাহলেই আমি খাওয়া-দাওয়া করব,

নতুবা নয়। কুমীর তখন হাসিমুখে বলল, গিন্নী, তুমি আমায় যা বলবে আমি তাই করব। কুমীরের বৌ তখন বলল, তোমার বানর-বন্ধু দিনরাত এমন মিষ্টি জামফল খায়। এতে তার হৃৎপিণ্ডটা নিশ্চয়ই খুব মিষ্টি হয়ে উঠেছে। আমার বড় সাধ, তার হৃৎপিণ্ডটা খাই। তুমি যেভাবে পার ওটা এনে দাও। স্ত্রীর কথা শুনে কুমীরের মুখ মলিন হয়ে গেল। সে বলল, একি কথা বলছ গিন্নী ? বানর আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। আমি কি করে তাকে এ কথা বলি। তার অনিষ্ট করা আমার কিছুতেই উচিত নয়। কুমীরের বৌ তখন রাগ করে বলল, যদি তুমি আমার কথা না শোন তাহলে আজই আমি বাপের বাড়ি চলে যাব। বউয়ের রাগ কিছুতেই কমে না দেখে কুমীর নিরূপায় হয়ে বলল, তুমি আমার ওপর রাগ কোরো না। আমি তোমার সাধ মেটানোর চেষ্টা করব। দেখা যাক, কতদূর কি করতে পারি।

পর দিন ঘুম থেকে উঠে কুমীর বানরের কাছে গেল, অভিমানভরে ও বিমর্ষ-ভাবে বানরকে বলল, বন্ধু, আমি রোজ-রোজ তোমার বাড়ী আসি, কিন্তু তুমি কখনও আমাদের বাড়ি যাও না। এ আমার মোটেই ভাল লাগে না। কুমীরের কথা শুনে বানর বলল, বন্ধু, আমি ডাঙার জীব। সাঁতার জানি না। আমি কি করে মাঝ নদীতে তোমার বাসায় যাব।

কুমীর বলল, আমার বৌ তোমাকে নেমন্তন্ন করেছে। তোমার জন্য ভাল-ভাল খাবার তৈরি করেছে, তোমাকে আমার সঙ্গে আজ যেতেই হবে। আমি সাঁতার কাটব, তুমি আমার পিঠে চ'ড়ে আমাদের বাড়ি যাবে।

বানর কুমীরকে খুব বিশ্বাস করত। সে কুমীরের কুমতলবের কথা কিছুই টের পেল না। একটু ইতস্তত করে সে কুমীরের পিঠে চড়ে বসল। কুমীর সাঁতার কেটে কিছু দূর গেল। সে ভাবল বানর আর কিছুতেই পালাতে পারবে না। অতএব এখন আসল কথাটা বলতে দোষ কি ? সে মুচকি হেসে বানরকে বলল, তোমাকে কেন আমাদের বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছি বল তো ?

বানর বলল, কেন আবার ? নেমন্তন্ন খাওয়ার জন্য। বানরের কথা শুনে কুমীর হি হি করে হেসে উঠল। সে বলল, আমার বৌ-য়ের সাধ হয়েছে তোমার হৃৎপিণ্ড খাবে। তাই আমি কায়দা করে তোমায় নিয়ে এসেছি। মরবার আগে এখন একবার ভগবানের নাম কর।

কুমীরের কথা শুনে বানরের বুকের ভেতরটা হিম হয়ে গেল। তবু বিপদে পড়ে সাহস হারাল না সে। নির্ভয়ে কুমীরকে বলল, বন্ধু, তোমার এই কথা আমায় আগে বলনি কেন ? হৃৎপিণ্ডটা সঙ্গে আনতে ভুলে গেছি আমি। জাম গাছের ডালে ওটা রেখে এসেছি। এখন কি করি বল তো ? কুমীর বানরের কথা শুনে হতবাক হয়ে গেল। সে কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, তোমার হৃৎপিণ্ড না পেলে আমার বৌ আমাকে

নাজেহাল করবে। অতএব চল জামগাছের দিকে ফিরে যাই। সেখান থেকে তাড়াতাড়ি তোমার হৃৎপিণ্ডটা নিয়ে আসি। কুমীরের কথায় বানর তখনি রাজি হল।

কুমীর বানরকে পিঠে করে নিয়ে এল জাম গাছের কাছে। বানর তখন কুমীরের পিঠ থেকে মাটিতে নেমে এক লাফে গাছের ওপর উঠল। একটু জিরিয়ে নিয়ে সে কুমীরকে চিৎকার করে বলল, ওরে বোকা সকলেরই হৃৎপিণ্ড বুকের মধ্যে থাকে। তাকে অন্য কোথাও রাখা সম্ভব নয়। ভগবানের অসীম দয়ায় আজ আমি প্রাণ ফিরে পেলাম। কুমীর এবার তার বোকামি বুঝতে পারল। তবু শেষ চেষ্টা হিসেবে সে হাসিমুখে বানরকে বলল, বন্ধু, তোমার সঙ্গে এতক্ষণ ঠাট্টা করছিলাম মাত্র। তাড়াতাড়ি নেমে এস। চল আমাদের বাড়ী যাই।

বানর তখন রেগে বলল, তোমার কোন কথাই আমি আর বিশ্বাস করি না। বুদ্ধিমানেরা একবার ঠকিতে পারে, দ্বিতীয় বার নয়।

অনুশীলনী

১। জামগাছটি কোথায় ছিল? এর ফলগুলি কেমন ছিল?

২। বানর কোথায় বাস করত? সে কি খেয়ে থাকত? সে কি বোকা ছিল?

৩। কুমীর কোথায় বাস করত? সে চালাক ছিল, না বোকা ছিল?

৪। কুমীর কি প্রকৃতির ছিল? কুমীরের বৌ কুমীরের কাছে কি আব্দার করেছিল?

৫। কুমীর কি বানরকে সত্যি সত্যি খাওয়ার জন্য নেমন্তন্ন করেছিল?

৬। কুমীর কখন বানরকে তার মনের কথা বলেছিল?

৭। বানরটি কি সত্যিই তার হৃৎপিণ্ড জামগাছে রেখে এসেছিল? হৃৎপিণ্ড কোথায় থাকে?

৮। বানর কিভাবে রক্ষা পেল?

৯। ডান পাশের সঠিক শব্দটি দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ কর:

(ক) বানর — বাস করে। (জলে, ডাঙায়)

(খ) কুমীর — বাস করে। (ডাঙায়, জলে)

(গ) জামফল খুব —। (টক, মিষ্টি)

(ঘ) বানর বিপদে — হারাল না। (বুদ্ধি, সাহস)

১০। নিচের শব্দগুলি দিয়ে এক-একটি বাক্য রচনা কর:

বন্ধু, হৃৎপিণ্ড, বানর, আব্দার, সাহস, সূর্য।

ভিক্ষুক রাজা

অনেক দিন আগে এক দেশে এক ধনী রাজা ছিলেন। একদিন তিনি ঘুরতে ঘুরতে রাজধানীর কোলাহল পেরিয়ে এক বনের মধ্যে এসে হাজির হলেন।

সবুজ পাতায় ছাওয়া গাছ গাছালী, পাখির কূজন, ঝরণার কলতান, রংবেরং-এর ফুলের শোভা—বড় মনোরম এ বনের পরিবেশ। রাজা বনের ভেতর কিছুদূর যাওয়ার পর একটা কুটীর দেখতে পেলেন। তিনি কুটীরের ভেতরে ঢুকে কাউকে দেখতে পেলেন না। দেখলেন দড়িতে, টাঙানো আছে গাছের একটা বাকল। মেঝেতে পাতা রয়েছে হরিণের চামড়ার একটা আসন। তিনি বুঝলেন এটা কোন সন্ন্যাসীর কুটীর। ঠিক ঐ সময় এক প্রিয়দর্শন সন্ন্যাসী হাতে কমণ্ডলু ও ফুলের সাজি নিয়ে কুটীরে ঢুকলেন।

রাজাকে দেখে সন্ন্যাসী বললেন—মঙ্গল হোক। একটা আসন পেতে দিয়ে বললেন—বসুন অতিথি।

রাজা বসলেন।

সন্ন্যাসী খাবার জন্য রাজাকে কিছু ফল দিলেন। রাজা তৃপ্তি-সহকারে সেগুলি খেলেন এবং সন্ন্যাসীর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

পূজাপাঠ সেরে সন্ন্যাসী রাজার সামনে এসে দাঁড়ালেন। একটা থলিতে-ভরা কিছু টাকা সন্ন্যাসীর কাছে দিয়ে রাজা বললেন, এই সামান্য অর্থ গ্রহণ করে আমাকে ধন্য করুন।

সন্ন্যাসী এতে রাজি হলেন না। তিনি বললেন, গাছের বাকলে আমার কাপড়ের অভাব মেটে। বন থেকে পেড়ে আনা ফল ও ঝরণার জলেই আমার ক্ষুধা-পিপাসার নিবৃত্তি হয়। আমার অর্থের কোন প্রয়োজন নেই।

রাজা বললেন—আমি এদেশের রাজা। আমার প্রচুর অর্থ। আপনি সামান্য এই দান গ্রহণ করলে খুব খুশি হতাম। সন্ন্যাসী বললেন, মহারাজ ক্ষমা করবেন। আপনার দান আমি গ্রহণ করতে পারছি না। এতে আমার লোভ বাড়বে। সাধনায় বিঘ্ন ঘটবে।

রাজা তখন সন্ন্যাসীকে তাঁর রাজপ্রাসাদে আতিথ্য গ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। সন্ন্যাসী রাজি হলেন।

কিছু দিন পরে সন্ন্যাসী একদিন রাজ-বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন।

বিরাট রাজপ্রাসাদ। লোক-লস্করে চারদিক গমগম্ করছে। রাজা সিংহাসন থেকে নেমে এসে অতিথি-সন্ন্যাসীকে সযত্নে ভেতরে নিয়ে গেলেন।

রাণী নিজের হাতে বহু সুখাদ্য রান্না করে সন্ন্যাসীকে খেতে দিলেন।

রাজা জোর হাতে সন্ন্যাসীকে জানালেন, তিনি নিঃসন্তান। সন্ন্যাসী তাঁকে আশীর্বাদ করুন, তিনি যেন সন্তান লাভ করে সুখী হতে পারেন এবং রাজ্যের সীমা আরও বাড়াতে পারেন।
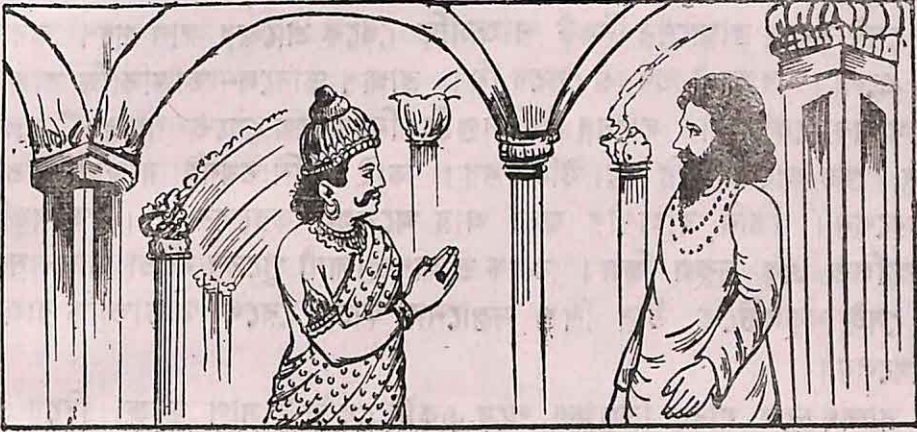
সন্ন্যাসী কোন কিছু গ্রহণ না করে চলে যেতে উদ্যত হলেন। তিনি রাজাকে বললেন, আপনার আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই। আপনি ভিক্ষুক। ক্ষমা করবেন, ভিক্ষুকের দেওয়া কোন দান আমি গ্রহণ করি না। এই বলে সন্ন্যাসী রাজপ্রাসাদ থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন।

মানুষের চাওয়ার শেষ নেই। যতই থাকুক আরও চাই। তাই তার মনে শান্তি থাকে না। শান্তি পেতে হলে যার যা আছে তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা উচিত।

অনুশীলনী

১। রাজা কিভাবে বনে গেলেন। বনে গিয়ে তিনি কি দেখলেন ?

২। সন্ন্যাসী রাজাকে কি খেতে দিলেন ?

৩। রাজা সন্ন্যাসীকে কি দিতে চাইলেন ? সন্ন্যাসী তা গ্রহণ করেছিলেন কি ?

৪। রাজার প্রাসাদে সন্ন্যাসী কেন এলেন ? সন্ন্যাসীকে কিভাবে আপ্যায়ন করা হোল ?

৫। রাজা সন্ন্যাসীর কাছে কি আশীর্বাদ প্রার্থনা করলেন ?

৬। সন্ন্যাসী রাজপ্রাসাদ হতে না খেয়ে চলে গেলেন কেন ?

৭। মানুষের মনে শান্তি থাকেনা কেন ?

৮। শান্তি পেতে হলে কি করা উচিত ?

ব্রাহ্মণ নকুল ও কেউটে সাপের কথা

পুরাকালে উজ্জয়িনী নগরে এক ব্রাহ্মণ ও তাঁর স্ত্রী বাস করতেন। তাঁদের এক শিশু সন্তান ছিল। একদিন ব্রাহ্মণী তার শিশু সন্তানটিকে ব্রাহ্মণের কাছে রেখে স্নান করতে গেলেন। ব্রাহ্মণ তাকে তখন ঘুম পাড়াতে লাগলেন।

সেই সময়ে ব্রাহ্মণের নিকট রাজবাড়ি থেকে শ্রাদ্ধের দান গ্রহণ করার জন্য নিমন্ত্রণ এলো। ব্রাহ্মণী তখনও ফেরে নি। ব্রাহ্মণ ভাবলেন তাড়াতাড়ি রাজবাড়িতে না গেলে অন্য কেউ তাঁর দানের জিনিসগুলি নিয়ে চলে যেতে পারে। ব্রাহ্মণ ঠিক করলেন, শুভ কাজে দেরি করা উচিত নয়। তাই তিনি তখনই রাজবাড়িতে যাওয়া স্থির করলেন। তিনি ব্রাহ্মণীর জন্য আর অপেক্ষা করলেন না। অনেকদিন ধরে তাঁর পালিত এক নকুল ছিল। তাকে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী পুত্রের মতো ভালবাসতেন। ব্রাহ্মণ সেই নকুলটিকে তাঁর শিশু সন্তানের কাছে রেখে তাড়াতাড়ি রাজবাড়িতে চলে গেলেন।

ব্রাহ্মণ চলে যাবার কিছুক্ষণ পরে একটা কেউটে সাপ দরজা দিয়ে ব্রাহ্মণের ঘরে ঢুকল। শিশুটি সেখানে ঘুমিয়েছিল। নকুল সাপটিকে দেখতে পেয়ে গর্জন করে
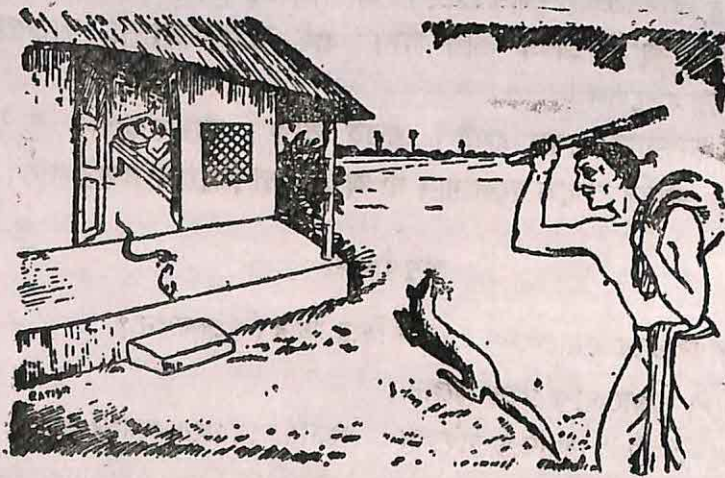
উঠল। সাপটিও ভয়ংকর ভাবে ফোঁস ফোঁস করতে লাগল। এভাবে কিছুক্ষণ সাপ ও নকুলে লড়াই চলল। কিন্তু নকুলের সঙ্গে সাপ পারবে কেন। নকুল শীঘ্রই সাপটিকে টুকরো টুকরো করে ফেলল।

তখনও ব্রাহ্মণী স্নান করে ফিরে আসেন নি।

এদিকে ব্রাহ্মণ রাজবাড়িতে যাবার সঙ্গেসঙ্গে দানের জিনিসগুলি পেয়ে গেলেন। তখন তিনি তাড়াতাড়ি বাড়ীর দিকে রওনা হলেন।

ব্রাহ্মণ বাড়ি ফেরার সঙ্গেসঙ্গে নকুলটি আনন্দে দোরগড়ায় রক্তমাখা অবস্থায় ব্রাহ্মণের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে। নকুলকে রক্তমাখা অবস্থায় দেখে ব্রাহ্মণ মনে করলেন নকুলটি তাঁর শিশু সন্তানকে মেরে ফেলেছে। তিনি রাগে জ্বলে উঠলেন। প্রকৃত ব্যাপারটা না জেনে তিনি নকুলকে মেরে ফেললেন।

তারপর আর একটু এগিয়ে ঘরে ঢুকে দেখলেন যে তাঁর শিশু সন্তান বিছানায় শুয়ে আরামে ঘুমোচ্ছে, আর নীচে একটা সাপ টুকরো-টুকরো হয়ে পড়ে আছে, ব্রাহ্মণ তখন প্রকৃত ব্যাপার বুঝতে পেরে শোকে অধীর হয়ে হা-হুতাশ করতে লাগলেন। তাঁর পোষা নকুলটি না থাকলে সাপটি তাঁর শিশু সন্তানটিকে কামড়ে মেরে ফেলত। ব্রাহ্মণ তাঁর হঠকারিতায় খুবই অনুতপ্ত হলেন। কিন্তু তখন আর তাঁর কিছুই করার ছিল না।

প্রকৃত ব্যাপার না জেনে যে ব্যক্তি অন্যায় কাজ করে, সে পরে কষ্ট ভোগ করে।

অনুশীলনী

১। ব্রাহ্মণ কোথায় বাস করতেন ? তাঁর পরিবারে কে-কে ছিল ?

২। ব্রাহ্মণ কেন রাজবাড়ি গেলেন ? না গেলে তাঁর কি ক্ষতি হত ?

৩। নকুল কে ছিল ? ব্রাহ্মণ তার শিশুসন্তানটিকে কার কাছে রেখে গিয়েছিলেন ?

৪। নকুল কিভাবে ব্রাহ্মণের শিশু সন্তানের প্রাণরক্ষা করেছিল ?

৫। নকুলকে কেন ব্রাহ্মণ মেরে ফেললেন ? তাকে মারার পর ব্রাহ্মণের কি অনুতাপ হয়েছিল ?

৬। নিচের শব্দগুলি দ্বারা এক-একটি বাক্য রচনা কর :
নিমন্ত্রণ, নকুল, রাগ, অধীর, পোষা, প্রকৃত।

অতি লোভের পরিণাম

অনেকদিন আগের কথা। তখন বারাণসীর রাজা ছিল ব্রহ্মদত্ত। তাঁর রাজ্যে বাস করত এক গরীব ব্রাহ্মণ। তাঁর স্ত্রী ও তিন কন্যা ছিল।

কিছুদিন পরে ব্রাহ্মণ মারা গেলেন। সংসারে অভাব আরও বেড়ে গেল। আয় করার কেউ নেই। সাহায্য করার মত আত্মীয়-স্বজনও কেউ নেই। তখন ব্রাহ্মণের স্ত্রী পাড়া-পড়শীর কাজ করে কোন রকমে দু-মুঠো ভাতের ব্যবস্থা করতে লাগলেন। খুবই দীন ভাবে তাদের সংসার চলতে লাগল।

এদিকে মৃত্যুর পর ব্রাহ্মণের নতুন জন্ম হল। তিনি সোনার হাঁস হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন। সোনার পালক দিয়ে মোড়া তাঁর সারা শরীর। হাঁস হয়ে জন্মালেও গত
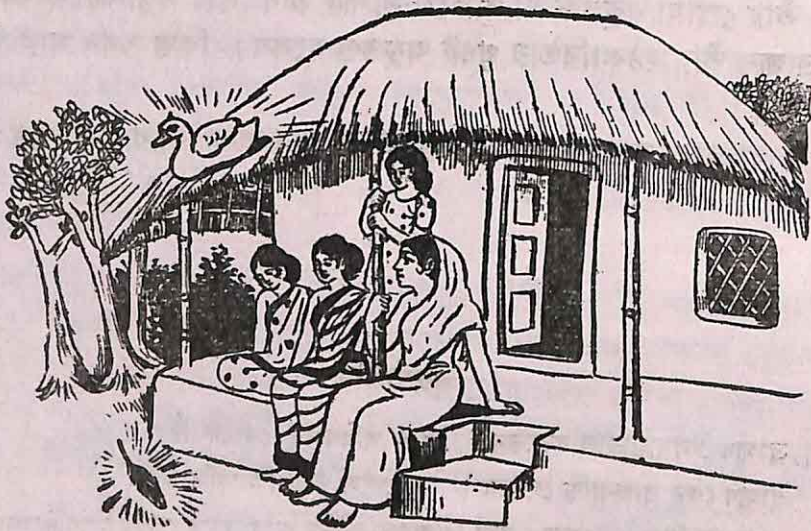
জন্মের বাসনা তাঁর দূর হলো না। পূর্ব জন্মের স্ত্রী ও মেয়েদের দেখার খুব ইচ্ছা হল। তাই তিনি রোজ সকালে নিজের বাড়ীর চালে গিয়ে বসতে লাগলেন।

ব্রাহ্মণের মেয়েরা সোনার পালকে মোড়া হাঁসটির দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকত।

ওরা একদিন জিজ্ঞেস করল, "তুমি কে, কোথা থেকে এসেছ?" সোনার হাঁসটি উত্তর দিল, "আমি তোমাদের বাবা। মৃত্যুর পরে হাঁস হয়ে জন্মেছি। তোমাদের দুঃখদুর্দশা দেখে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। আমার শরীর সোনার পালকে ভরা। মাঝে-মাঝে আমি এসে একটা করে সোনার পালক তোমাদের দিয়ে যাবো। সেটা বেচে স্বচ্ছন্দে তোমরা জীবন যাপন করতে পারবে।"

তারপর হাঁসটি একটা সোনার পালক ফেলে উড়ে চলে গেল। ব্রাহ্মণী বাড়ী এলে মেয়েরা তাকে সব কিছু বলল ও সোনার পালকটি দিল। সেই সোনার পালকটি

বেচে ব্রাহ্মণী অনেক টাকা পেলেন। মেয়েদের নিয়ে তিনি বেশ সুখেই জীবন যাপন করতে লাগলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণীর লোভ দিনে দিনে বেড়ে গেল।

তিনি একদিন মেয়েদের ডেকে বললেন, "হাঁসটি বলছে সে তোমাদের বাবা। কথাটা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। যদি সে তোমাদের বাবাও হয়, সে এখন ইতর-জীব। তার কথায় বিশ্বাস নেই। এখন আসছে পরে নাও আসতে পারে। তার চেয়ে ওকে ধরে ওর সব পালকগুলি ছাড়িয়ে নিলে আর আমাদের কোন কষ্ট থাকবে না। আমরা সারাজীবন খুব আরামে থাকতে পারব।"

মায়ের এই কথা শুনে মেয়েরা খুব আপত্তি করল। তারা বলল "গা থেকে পালকগুলি তুলে নিলে বাবার খুব কষ্ট হবে। আমরা এ অন্যায় কাজ করতে পারব না।"

মেয়েদের এই কথা শুনে ব্রাহ্মণী রেগে গিয়ে বললেন, "বাবাত আর বাবা নেই। এখন ইতর জীব। তার জন্য এত দরদ কেন? যদি তোরা না পারিস তা হলে আমি একাই করবো।"

তার পরের দিন হাঁসটি এলে ব্রাহ্মণী তাকে কাছে ডাকলেন। হাঁসটি কাছে এলে জোর করে তার শরীর থেকে সব পালক ছাড়িয়ে নিলেন। সোনার হাঁসটি যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল। উড়বার চেষ্টা করল, কিন্তু উড়তে পারল না। সেখানেই পড়ে রইল।

কিন্তু ব্রাহ্মণীর সাধ পূর্ণ হলো না। তিনি হাঁসের শরীর থেকে যে সোনার পালকগুলি তুলে নিয়েছিলেন সেগুলি কিছুক্ষণের মধ্যে সাধারণ সাদা পালক হয়ে গেল।

কিছুদিন পরে হাঁসটির নতুন পালক জন্মাল। কিন্তু এবারে সোনার পালক হল না। সাধারণ হাঁসের মত সাদা পালক হল। তারপর একদিন সুযোগমত হাঁসটি পালিয়ে গেল।

গত জন্মে ভগবান বুদ্ধ ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পরে তিনি সোনার হাঁস হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। সেই ব্রাহ্মণের স্ত্রী ছিল ভয়ঙ্কর লোভী। অতি লোভের জন্য ব্রাহ্মণী যা পাচ্ছিলেন তাও হারালেন।

অনুশীলনী

১। ব্রহ্মদত্ত কোথাকার রাজা ছিলেন?
২। গরীব ব্রাহ্মণের সংসারে কেন অভাব ছিল?
৩। সোনার হাঁস আসলে কে ছিল?
৪। সোনার হাঁস কিভাবে তার পূর্বজন্মের সংসারের দুঃখ দূর করতে চাইল?
৫। সোনার হাঁসের কিভাবে সোনার পালকগুলি চলে গেল?
৬। কে খুব লোভী ছিল? তার লোভের পরিণাম কি হল?
৭। শূন্যস্থান পূরণ কর :—
(ক) রাজা ব্রহ্মদত্তের — বাস করত এক গরীব —।
(খ) ব্রাহ্মণ — হয়ে জন্মগ্রহণ করেন।
(গ) ব্রাহ্মণের — ছিল খুব —।

বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব লাভ

বিশ্বামিত্র ছিলেন গাধিরাজের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর তিনি রাজ্য লাভ করে শাসন করতে আরম্ভ করেন। তাঁর অনেক পুত্র, অতুল ঐশ্বর্য ও অসংখ্য সৈন্য ছিল।

একদিন তিনি অনেক সৈন্য ও পুত্রদের সাথে নিয়ে দেশভ্রমণে বের হলেন। ঘুরতে-ঘুরতে তিনি বশিষ্ঠ মুনির আশ্রমে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

মুনি ঋষিদের মধ্যে বশিষ্ঠ ছিলেন শ্রেষ্ঠ। বিশ্বামিত্র তাঁকে প্রণাম জানালেন। বশিষ্ঠও তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। বশিষ্ঠের একটা কামধেনু ছিল। তার নাম নন্দিনী। বশিষ্ঠ তার কাছে যা চাইতেন তাই পেতেন। নন্দিনীর সাহায্যে বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র, তাঁর সৈন্য ও পুত্রদের ভালভাবে খাওয়ালেন।

বশিষ্ঠের সম্মান রক্ষা হল। বিশ্বামিত্রও খুব সন্তুষ্ট হলেন। কামধেনুর অলৌকিক গুণের কথা জানতে পেরে বিশ্বামিত্রের লোভ হল। তিনি ভাবলেন এরকম কামধেনু
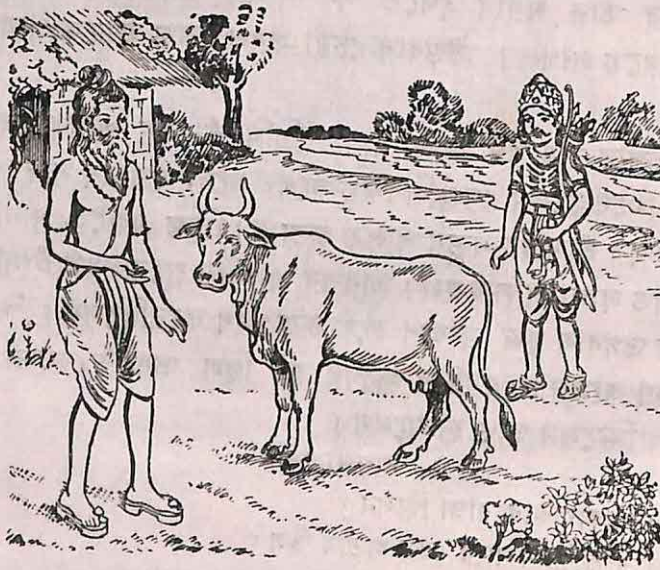
থাকলে কোন জিনিসের অভাব হবে না। তিনি একহাজার গাভীর বদলে বশিষ্ঠের কাছে কামধেনুটি চাইলেন। কিন্তু বশিষ্ঠ দিতে রাজী হলেন না। এতে উভয়ের মধ্যে বিবাদ শুরু হল। বিশ্বামিত্র তাঁর সৈন্যদের সাহায্যে জোর করে নন্দিনীকে নিয়ে যেতে উদ্যত হলেন। বশিষ্ঠ তখন নন্দিনীর সাহায্যে অনেক সৈন্য সৃষ্টি করে বিশ্বামিত্রের সৈন্যদের ধ্বংস করলেন। এরপরে বিশ্বামিত্রের পুত্ররা বশিষ্ঠকে আক্রমণ করলে বশিষ্ঠ ব্রহ্মতেজে তাদের মেরে ফেললেন।

বিশ্বামিত্র পরাজিত হয়ে রাজধানীতে ফিরে এলেন। তিনি বুঝতে পারলেন ক্ষত্রবলের চেয়ে ব্রহ্মবল বড়। বিশ্বামিত্র তখন ক্ষোভে দুঃখে রাজ্য ত্যাগ করে মহাদেবের তপস্যা শুরু করলেন। মহাদেব তাঁর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে বর দিতে রাজি হলেন। বিশ্বামিত্র মহাদেবের কাছে নানা রকম অস্ত্র প্রার্থনা করলেন।

মহাদেবের বরে নানারকম অস্ত্র লাভ করে বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের আশ্রমে গিয়ে ওটা নষ্ট করতে লাগলেন।

দেখতে দেখতে আশ্রমের পরিবেশ নষ্ট হয়ে গেল। সেখানকার মুনি-ঋষিরা প্রাণভয়ে ছুটাছুটি করতে লাগল। বশিষ্ঠ তখন তাঁদের শান্ত হতে বলে নিজে ব্রহ্মদণ্ড হাতে নিলেন। বিশ্বামিত্র তখন তাঁকে মহাদেবের বরে পাওয়া আগ্নেয়াস্ত্র ছাড়লেন। বশিষ্ঠ ব্রহ্মদণ্ডের সাহায্যে সেটা নষ্ট করে দিলেন, এরপর বিশ্বামিত্র সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়লেন। দেবতা ও অন্যান্য মুনি-ঋষিরা খুব ভয় পেলেন, কিন্তু বশিষ্ঠ নির্বিকার। বশিষ্ঠ ইচ্ছা করলে ব্রহ্মদণ্ডের সাহায্যে বিশ্বামিত্রকে হত্যা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করলেন না, তিনি যে ব্রাহ্মণ, ক্ষমাই তাঁর ধর্ম। তাই তিনি ব্রহ্মদণ্ড রেখে দিলেন। বিশ্বামিত্র তখন ব্রাহ্মণত্ব লাভ করার জন্য কঠোর তপস্যা শুরু করলেন। বহু বৎসর তিনি কঠোর তপস্যা করলেন। তপস্যার পর ব্রহ্মা এসে বিশ্বামিত্রকে বললেন, 'বিশ্বামিত্র আমি তোমার তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়েছি। তুমি এতদিন ছিলে রাজা এখন হলে রাজর্ষি।' বিশ্বামিত্র এতে সন্তুষ্ট হলেন না। তিনি বশিষ্ঠের সমকক্ষ হতে চান। তাই তিনি পুষ্করতীর্থে গিয়ে কঠোর তপস্যা আরম্ভ করলেন। তিনি ঠিক করলেন ব্রহ্মর্ষি তাঁকে হতেই হবে। কিন্তু ব্রহ্মর্ষি হওয়া সহজ কথা নয়। ব্রহ্মর্ষি হতে হলে তাঁকে সংযত ও জিতেন্দ্রিয় হতে হবে। তিনি অনেক দিন ধরে কঠোর তপস্যা করলেন। ব্রহ্মা তখন তাঁকে মহর্ষি আখ্যা দান করেন। বিশ্বামিত্র এতেও সন্তুষ্ট হলেন না, কারণ তাঁর উদ্দেশ্য ব্রহ্মর্ষি হওয়া। তাই তিনি আরও কঠোর তপস্যা আরম্ভ করলেন। একদিন বিশ্বামিত্র তাঁর সামান্য খাবার খেতে শুরু করবেন, এমন সময় দেবরাজ ইন্দ্র তাঁকে ছদ্মবেশে পরীক্ষা করতে আসলেন। ইন্দ্র বললেন, 'আমি সারাদিন কিছুই খাইনি। আমি খুব ক্ষুধার্ত। আমাকে কিছু খেতে দিন।' বিশ্বামিত্র তখন হাসিমুখে তাঁর খাবার ছদ্মবেশী ইন্দ্রকে দিয়ে দিলেন।

এরপর বিশ্বামিত্র আবার তপস্যা শুরু করলেন। তাঁর কঠোর তপস্যার তেজে স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল ত্রিভুবন বিচলিত হল। তখন মুনি-ঋষি ও দেবতারা নিরূপায় হয়ে প্রজাপতি ব্রহ্মার কাছে গেলেন। তারা বললেন বিশ্বামিত্রের তেজে ত্রিভুবন ছারখার ও সৃষ্টি ধ্বংস হবার উপক্রম। তিনি যেন তাড়াতাড়ি এর একটা ব্যবস্থা করেন।

ব্রহ্মা তখন বিশ্বামিত্রের কাছে গিয়ে বললেন, 'বিশ্বামিত্র' তোমার তপস্যা সার্থক হয়েছে। তুমি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছ। আজ থেকে তুমি 'ব্রহ্মর্ষি' হলে।'

বিশ্বামিত্র ব্রহ্মার কথা শুনে সন্তুষ্ট হলেন। তিনি ব্রহ্মর্ষি হয়েছেন। তিনি আজ বশিষ্ঠের সমকক্ষ। কিন্তু বশিষ্ঠ কি তাঁকে ব্রহ্মর্ষি বলে স্বীকার করবেন ?

বশিষ্ঠ ছিলেন প্রকৃত ব্রাহ্মণ, তিনি ছিলেন ক্রোধ ও হিংসার উর্ধ্বে। বিশ্বামিত্র যখন তাঁর নিকট গেলেন তখন তিনি তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। তাঁদের দুজনের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব হল। কঠোর তপস্যা বলে ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করলেন। সাধনার বলে যে অসাধ্য সাধন করা যায় বিশ্বামিত্র তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

অনুশীলনী

১। বিশ্বামিত্র কে ছিলেন ? বশিষ্ঠ কে ছিলেন ?

২। বশিষ্ঠের কামধেনুর নাম কি ? তার কি আলৌকিক গুণ ছিল ?

৩। আশ্রমবাসী বশিষ্ঠ কি উপায়ে বিশ্বামিত্র, তাঁর পুত্রদের ও সৈন্যদের ভালভাবে খাওয়াতে-পরাতে পেরেছিলেন ?

৪। বিশ্বামিত্র কেন রাজ্য ত্যাগ করে তপস্যা করেছিলেন ?

৫। বিশ্বামিত্রের কঠোর সাধনা সম্বন্ধে কি জান ?

৬। বিশ্বামিত্র শক্তিশালী রাজা হয়েও সামান্য একজন ঋষির নিকট পরাজিত হয়েছিলেন কেন ?

৭। শুদ্ধ করে লেখ :—

(ক) বিশ্বামিত্র ছিলেন / গাধিরাজের / উজ্জয়িনীরাজের পুত্র।

(খ) বশিষ্ঠের / বিশ্বমিত্রের একটি কামধেনু ছিল।

(গ) বিশ্বামিত্র পুরীতীর্থে / পুষ্করতীর্থে গিয়ে কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেন।

৮। শূন্যস্থান পূরণ কর :—

(ক) বিশ্বামিত্র — হয়ে রাজধানীতে ফিরে গেলেন।

(খ) বশিষ্ঠ ছিলেন প্রকৃত —।

(গ) — তপস্যাবলে — বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করলেন।

(ঘ) বিশ্বামিত্র তাঁর খাবার ছদ্মবেশী — দিয়া দিলেন।

৯। নীচের শব্দগুলি দিয়ে এক-একটি বাক্য গঠন কর :—

পুত্র, অসংখ্য, কামধেনু, সৃষ্টি, আক্রমণ, ক্ষমা, আশ্রম, ক্ষুধার্ত।

বীরবরের প্রভুভক্তি

বহুদিন আগের কথা। বর্ধমান নগরে রূপসেন নামে এক পণ্ডিত, দয়ালু, ন্যায়বান, পরোপকারী ও ধার্মিক রাজা ছিলেন।

একদিন বীরবর নামে এক যোদ্ধা তাঁর কাছে এসে কাজ চাইল। বীরবরের চেহারা দেখে ও তার সাথে কথা বলে রাজা খুব সন্তুষ্ট হলেন। তিনি বললেন, বীরবর কত টাকা বেতন পেলে তুমি আমার কাছে কাজ করতে পার ?

বীরবর বলল, মহারাজ, রোজ একহাজার সোনার মোহর পেলেই আমার চলবে। রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের পরিবারে কতজন লোক ? বীরবর বলল, আমরা চারজন—আমি, আমার স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়ে। রাজা বীরবরের কথাশুনে মনে-মনে চিন্তা করতে লাগলেন। এর পরিবার এত ছোট অথচ এত টাকা দরকার কিসের ? নিশ্চয় এর কোন অলৌকিক গুণ আছে। সুতরাং একে কাজে রেখে এর গুণ পরীক্ষা করা যাক। রাজা তখন তাঁর কোষাধ্যক্ষকে ডেকে বীরবরকে বেতন হিসেবে রোজ একহাজার সোনার মোহর দেওয়ার আদেশ দিলেন। বীরবর রোজ যথাসময়ে কাজে আসে এবং যাওয়ার সময় একহাজার সোনার মোহর নিয়ে বাড়ী যায়। বাড়ী গিয়ে সংসার খরচের জন্য সামান্য মোহর রেখে বাকীটা গরীব ও সাধু-সন্ন্যাসীদের সেবায় ব্যয় করে। প্রত্যহ সে এভাবে মোহর খরচ করত। সারাদিন এভাবে মোহর খরচ করে বীরবর অস্ত্রসস্ত্র নিয়ে রাত্রে রাজবাড়ী পাহারা দিত। রাজা তার সাহস ও শক্তি পরীক্ষা করার জন্য গভীর রাত্রে কঠিন কাজ করতে পাঠাতেন। বীরবর সে কাজ হাসি-মুখে করে আসত।

একদিন গভীর রাত্রে রাজা হঠাৎ নারীর কান্না শুনতে পেলেন। তিনি বীরবরকে ডেকে বললেন, বীরবর দক্ষিণ দিক হতে নারীর কান্না আসছে। তুমি তাড়াতাড়ি সেখানে যেয়ে এর কারণ জেনে আস। বীরবর যে আজ্ঞা মহারাজ বলে চলে গেল। রাজা তার সাহস ও শক্তি পরীক্ষা করার জন্য গোপনে গোপনে তাকে অনুসরণ করলেন।

বীরবর কান্না লক্ষ্য করে চলতে চলতে অবশেষে এক শ্মশানে যেয়ে উপস্থিত হল। সে দেখল এক পরম সুন্দরী কন্যা কপালে করাঘাত করতে করতে হাহাকার করে কাঁদছে। সে তাকে দেখে প্রথমে চমকে উঠল ও পরে জিজ্ঞেস করল, মা আপনি কে ? কেন এত রাত্রে এখানে এসেছেন, কেনই বা কাঁদছেন ? প্রথমে তিনি

কোন উত্তর দিলেন না, বরং আগের চেয়ে জোরে কাঁদতে লাগলেন। বীরবর বারবার অনুরোধ করায় তিনি বললেন, আমি রাজ্যলক্ষ্মী, রাজা রূপসেনের প্রাসাদে অন্যায় কাজ হয় বলে আমি সেখান থেকে চলে যাব। আমি গেলেই সেখানে অলক্ষ্মী ঢুকবে। তখন রাজার অমঙ্গল হবে এবং অল্প দিনের মধ্যেই সে মারা যাবে। এ কথা শুনে বীরবর চমকে উঠল। সে দেবীর কাছে করজোড়ে বলল, মা, আপনি বলে দিন কি করলে রাজা এই অমঙ্গলের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবে। আমি প্রয়োজনে নিজের জীবনের বিনিময়েও সে কাজ করব। তখন রাজ্যলক্ষ্মী বললেন, সে কাজ খুব কঠিন। তুমি কি সে কাজ করতে পারবে ? এখান থেকে পূব দিকে এক ক্রোশ দূরে মন্দিরে এক দেবী আছেন। যদি কেউ সেই দেবীর কাছে তার ছেলেকে নিজের হাতে বলি দেয়, তা হলে রাজা অমঙ্গলের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবে।

এ কথা শুনে বীরবর তাড়াতাড়ি বাড়ীর দিকে রওনা হল। রাজাও তাকে অনুসরণ করলেন। বীরবর বাড়ী যেয়ে তার স্ত্রীকে সব কথা খুলে বলল। তার স্ত্রী তখন ছেলেকে ডেকে বলল, বাছা তোমার মাথা কেটে দেবীকে অর্পণ করলে রাজা অমঙ্গলের হাত থেকে রক্ষা পাবে ও রাজ্য শক্তিশালী হবে। একথা শুনে ছেলে নির্ভয়ে বলল, মা, এতো আমার পরম সৌভাগ্য। প্রথমতঃ তোমার আদেশ পালন করছি, দ্বিতীয়তঃ বাবার কর্তব্য পালনে সাহায্য করছি, রাজার অমঙ্গল দূর করার জন্য এ তুচ্ছ শরীর দেবতার পায়ে নিবেদন করছি। ছেলের এ কথা শুনে বীরবর যতটা খুশী হল তার চেয়ে বেশী দুঃখিত হল।

রাজাও বীরবরের প্রভুভক্তি দেখে অভিভূত হলেন। কিছুক্ষণ পরে বীরবর সপরিবারে মন্দিরের দিকে রওনা হল। রাজাও তাদের অনুসরণ করলেন।

দেবীর মন্দিরে এসে বীরবর ভক্তিভরে দেবীর পূজা করে জোড়হাতে বলল, দেবী, তোমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য নিজের হাতে ছেলেকে বলি দিলাম। তোমার দয়ায় যেন রাজার সমস্ত অমঙ্গল দূর হয়। এই বলে বীরবর খড়্গ দিয়ে তার ছেলের মাথা কেটে দেবীর চরণে নিবেদন করল। বীরবরের মেয়ে ভাইকে খুব স্নেহ করত। সে-ও ভাইয়ের শোকে সেই খড়্গ দিয়ে নিজের মাথা কেটে ফেলল। বীরবরের স্ত্রী শোকে পাগল হয়ে আত্মহত্যা করল। বীরবর দেখল তার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা কেউ নেই। সেও খড়্গ দিয়ে নিজের মাথা কেটে ফেলল।

রাজা আড়ালে দাঁড়িয়ে সেই মর্মান্তিক দৃশ্য দেখলেন। তিনি ভাবলেন আমার রাজ্যের অমঙ্গলের জন্য প্রভুভক্ত সেবকের প্রাণ গেল। আমি এ রাজ্য ভোগ করব কোন্ মুখে ? তখন তিনি খড়্গটি তুলে নিজের বুকে বসাতে উদ্যত হলেন।

এমন সময় দেবী দুর্গা তার হাত ধরে ফেললেন। তিনি বললেন, বৎস, আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছি। তুমি আমার কাছে বর চাও। রাজা বললেন, মা, যদি

বর দিতে চাও তবে এখনই বীরবর ও তার পরিবারের সকলের জীবন দান কর। দেবী তথাস্তু বলে স্বর্গ থেকে অমৃত এনে বীরবর, তার স্ত্রী, পুত্র ও কন্যার গায়ে ছিটিয়ে
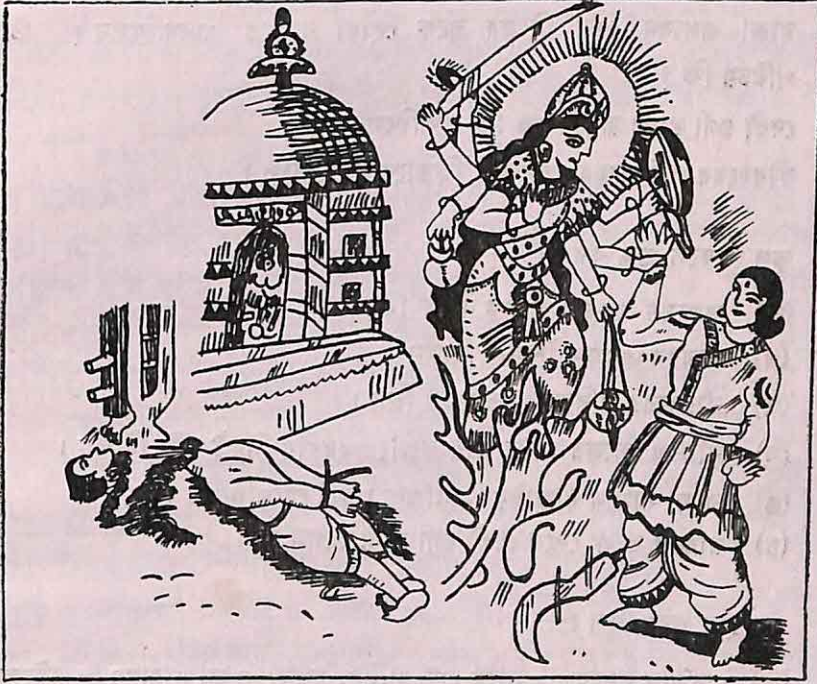
দিলেন। তারা সাথে সাথে সুস্থ হয়ে উঠল। রাজা এই দৃশ্য দেখে দেবীর পায়ে পড়ে তাঁর স্তব করতে লাগলেন। রাজার ভক্তি দেখে দেবী সন্তুষ্ট হলেন এবং তাকে বর দান করে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

পরদিন রাজা সভায় এসে বীরবরকে তার প্রভুভক্তির জন্য অর্ধেক রাজ্য দান করলেন।

এখন বলতো এদের মধ্যে কে সবচেয়ে মহৎ ?

অনুশীলনী

১। রূপসেন কে ছিলেন ? তিনি কিরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন ?

২। বীরবর কে ছিল ? তাঁর অপূর্ব প্রভুভক্তি সম্বন্ধে কি জান ?

৩। রাজা রূপসেন বীরবরকে দৈনিক কত সোনার মোহর বেতন দিতেন ? বীরবর সেই মোহর দিয়ে কি করত ?

৪। একদিন গভীর রাত্রে রাজা রূপসেন বীরবরকে কি বলেছিলেন ? তিনি গোপনে বীরবরের অনুসরণ করেছিলেন কেন ?

৫। বীরবর রাজ্যলক্ষ্মীকে কি বলেছিল ? রাজ্যলক্ষ্মীই বা তাকে কি বলেছিলেন ?

৬। রাজা রূপসেন কেন নিজের বুকে ছোরা বসাতে চেয়েছিলেন ? তাঁর কৃতজ্ঞতার পরিচয় কি ?

৭। দেবী দুর্গা রাজা রূপসেনকে কি বলেছিলেন ?

৮। বীরবরের পরিবারের লোকেরা কিভাবে বেঁচে উঠল ?

৯। ভুল থাকলে শুদ্ধ কর :—

(ক) রূপসেন একজন ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন ?
(খ) বীরবর একজন শিক্ষক ছিলেন।
(গ) বীরবরের পরিবারে তিন জন ছিল।
(ঘ) বীরবর নিজের হাতে তার কন্যাকে দেবীর নিকট বলি দিলেন।
(ঙ) রাজা সামনে দাঁড়াইয়া মর্মান্তিক দৃশ্যটি দেখেছিলেন।
(চ) রাজার ভক্তি দেখে দেবী দুর্গা সন্তুষ্ট হলেন না।

১০। শূন্যস্থান পূরণ কর :—

(ক) বর্ধমান নগরে — নামে এক ধার্মিক, দয়ালু ও ন্যায়পরায়ণ — ছিলেন।
(খ) — নামে এক যোদ্ধা রাজার নিকট — চাইল।
(গ) রাজা বীরবরের — দেখিয়া অভিভূত হলেন।
(ঘ) রাজার – দেখে — সন্তুষ্ট হলেন।

অদ্ভুত বিচারাসন

পুরাকালে ভারতে উজ্জয়িনী নামে এক বিখ্যাত নগরী ছিল। মালবের বিখ্যাত রাজা বিক্রমাদিত্য সেখানে রাজত্ব করতেন। ভারতবাসীরা আজও শ্রদ্ধার সাথে তাঁর নাম স্মরণ করে থাকে।

লোকে বলে তাঁর মত ন্যায়পরায়ণ বিচারক ইতিহাসে আর দেখা যায় না। তিনি বিচারাসনে বসে কখনও ভুল করতেন না। নির্দোষ লোককে কখনও শাস্তি দিতেন না। তিনি তাঁর আসনে বসে যে বিচার করতেন তা ন্যায়সঙ্গত হত। সকলে তাঁর খুব প্রশংসা করত। কোন জ্ঞানী ও ন্যায়পরায়ণ বিচারক সুবিচার করলে বলা হত তিনি বিক্রমাদিত্যের বিচারাসনে বসেছেন। কালক্রমে বিক্রমাদিত্যের প্রাসাদ ভগ্নস্তূপে পরিণত হল। সেই ভগ্নস্তূপগুলি ঘাস, মাটি ও পাথরের তলায় ঢাকা পড়ে গোচারণ ভূমিতে পরিণত হল। সাধারণ লোকেরা আগের কথা ভুলে গিয়েছিল। রাখালছেলেরা সেখানে গরু চড়াত ও সন্ধ্যা পর্যন্ত মাঠে খেলাধূলা করত। তারা একদিন সবুজ ঘাসে ঢাকা একটা মাটির ঢিবি দেখতে পেল। ঢিবিটা দেখতে ছিল ঠিক বিচারকের আসনের মত। রাখালছেলেদের মধ্যে এক জনের এক খেয়াল হল। সে গিয়ে ঢিবির উপর বসল। সে বলল বিচারকের অভিনয় করবে। অন্য রাখালছেলেদের কাছে তা বেশ মজার খেলা বলে মনে হল। তারা একটা নকল বিবাদ করে তার কাছে বিচারের জন্য নিয়ে এল। সে গম্ভীরভাবে মনোযোগ দিয়ে তাদের কথা শুনল ও ন্যায়-সঙ্গত বিচার করল। ছেলেরা তার অদ্ভুত বিচার ক্ষমতায় খুব আশ্চর্যান্বিত হল। তারা একটার পর একটা বিবাদ করে তার কাছে বিচারের জন্য আসতে লাগল। ছেলেটি প্রতিবার সব কথা মন দিয়ে শুনে বিজ্ঞ বিচারকের মতো বিচার করল। অনেকক্ষণ ধরে এ খেলা চলল। তারপর সন্ধ্যা হলে রাখালছেলেরা তাদের গরুগুলি নিয়ে নিজ-নিজ বাড়ী ফিরল।

তারা কিন্তু সেদিনের কথা ভুলতে পারল না। এরপর কোন বিবাদ হলে তারা
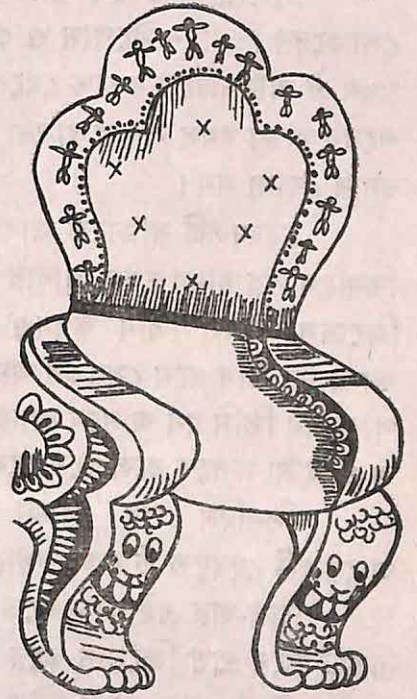
ছেলেটিকে মাটির ঢিবির উপর বসে বিচার করতে বলত। তার বিচার সব সময় নির্ভুল হত।

এভাবে রাখালছেলেটির খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। গ্রামের লোকেরা যখনই তার কাছে অভিযোগ নিয়ে আসত, তখনই তার ন্যায় বিচারে তারা সন্তুষ্ট হত। কালক্রমে তার বিচারের খ্যাতি সেখানকার রাজার কানে গেল। তিনি শুনে বললেন, রাখাল ছেলেটি নিশ্চয়ই ঢিবির নীচে পড়ে-থাকা বিক্রমাদিত্যের বিচারাসনে বসেছে। তাঁর সভার বিদ্বান লোকেরাও এ কথা সমর্থন করলেন। তখন রাজার খুব ইচ্ছা হল তিনি ন্যায়বান বিচারক হবেন। তিনি ঠিক করলেন বিক্রমাদিত্যের বিচারাসনটি মাটির নীচে থেকে তুলে আনবেন। তিনি ভাবলেন বিক্রমাদিত্যের আসনে বসতে পারলেই ন্যায় বিচার করতে পারবেন। তাঁর আদেশে লোকেরা ঢিবিটা খুঁড়ে সেই আশ্চর্যজনক আসনটি পেল। আসনটিতে ছিল পঁচিশটি দেবদূতের মূর্তি।

রাজার আদেশে সে আসনটি তাঁর প্রাসাদে আনা হল। রাজা দেশের লোকদের তিনদিন উপোস ও প্রার্থনা করতে আদেশ দিলেন। তিনদিন পর রাজা যখন ঐ আসনটিতে বসতে গেলেন তখন একটি দেবদূত মূর্তি রাজাকে বলল যেহেতু পরের রাজ্য দখল করার বাসনা তার মনে রয়েছে তাই তিনি বিক্রমাদিত্যের সিংহাসনে বসার যোগ্য নন।

দেবদূতটি রাজাকে আবার তিনদিন উপোস ও প্রার্থনা করতে বলে চলে গেল। তিনদিন পর রাজা যখন আবার আসনটিতে বসতে গেলেন তখন একটি দেবদূত তাঁকে জিজ্ঞেস করল তিনি কখনও পরের জিনিসের ওপর লোভ করেছেন কিনা। রাজা ভাবলেন তাঁর মনে সেরকম অন্যায় ইচ্ছা কখনও কখনও হয়েছে। তিনি তখন বুঝতে পারলেন তিনি সে আসনে বসার উপযুক্ত নন। দেবদূতটি তাঁকে আরও তিনদিন উপোস ও প্রার্থনা করতে বলে বনে চলে গেল।

তিনদিন পর রাজা আবার আসনটিতে বসার চেষ্টা করলেন। তখন আরেকটি দেবদুত তাঁকে সেখানে বসতে বাধা দিল।

বার-বার এই রকম হতে লাগল। প্রতিবারেই একটি করে দেবদূত রাজাকে একটি করে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে চলে গেল। এভাবে ছিয়ানব্বই দিন পর চব্বিশটি দেবদূত উড়ে গেল, বাকী রইল শুধু একটি।

রাজা আরো তিনদিন উপোস করলেন। তারপর একশ দিনের দিন তিনি অবার আসনটিতে বসার চেষ্টা করলেন। এবার তাঁর খুব আশা যে তিনি সেখানে বসার যোগ্য হবেন। কিন্তু শেষ দেবদূতটি তাঁকে জিজ্ঞেস করল তাঁর মন শিশুর মনের মত কোমল ও নির্মল কিনা। যদি তা হয় তবেই শুধু তিনি সে আসনে বসতে পারবেন। রাজা বুঝলেন তাঁর মন শিশুর মনের মতো কোমল ও নির্মল নয়। সুতরাং তিনি

আসনটিতে বসার উপযুক্ত নন। এরপর শেষ দেবদূতটি আসনটি নিয়ে উড়ে চলে গেল।

শেষ দেবদূতটি চলে গেলে রাজা খুব ব্যথিত হলেন এবং সে ব্যাপারটি সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলেন।

অবশেষে তিনি এই পরম সত্যটি বুঝতে পারলেন যে, শিশুর মতো কোমল ও নির্মল মন না হলে মানুষ ন্যায়পরায়ণ হতে পারে না ও সম্পূর্ণ ন্যায়বিচার করার অধিবার লাভ করতে পারে না।

অনুশীলনী

১। উজ্জয়িনী কিসের জন্য বিখ্যাত ছিল ?

২। বিক্রমাদিত্য কিরূপ বিচারক ছিলেন ?

৩। রাখাল ছেলেটি কেন ন্যায়সঙ্গত বিচার করতে পারত ?

৪। রাখাল ছেলের কাছে প্রথমে কারা বিচারের জন্য আসত ?

৫। রাজা ন্যায়বান বিচারক হওয়ার জন্য কি করেছিলেন ?

৬। রাজা কি সিংহাসনে বসতে সক্ষম হয়েছিলেন ? সক্ষম না হয়ে থাকলে কেন হন নাই ?

৭। রাজা সিংহাসনে বসতে গেলে কারা বাধা দিয়েছিল ?

৮। ন্যায় বিচারকের অধিকার কারা লাভ করতে পারেন ?

৯। ডানদিক থেকে শুদ্ধ শব্দটি নিয়ে শূন্যস্থানে বসাও :—

(ক) বিক্রমাদিত্য ছিলেন — রাজা। (উজ্জয়িনী / বারাণসীর)

(খ) বিক্রমাদিত্য — লোককে শাস্তি দিতেন। (নির্দোষ / দোষী)

(গ) রাখাল ছেলের — সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। (সুখ্যাতি / কুখ্যাতি)

(ঘ) আসনটিতে ছিল — দেবদূত মূর্তি। (পঁচিশটি / কুড়িটি)

(ঙ) রাজা আরও — উপোস করলেন। (তিনদিন / চারদিন)

পিতামাতাই সাক্ষাৎ দেবতা

বহুদিন আগে কৌশিক নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন তাপস। তপস্যা করে তিনি এমন ক্ষমতাবান হয়েছিলেন যে, রাগের বশে যার দিকে তাকাতেন সে-ই ভস্ম হয়ে যেত।

একদিন কৌশিক এক গাছের নীচে বসে ধর্মশাস্ত্র আলোচনা করছিলেন। এমন সময় এক বক এসে গাছের ডালে বসল। কিছুক্ষণ পরে সে কৌশিকের গায়ে মল ত্যাগ করল। এতে কৌশিক খুব রেগে গিয়ে বকটির দিকে তাকানো-মাত্র ওটা ভস্ম হয়ে গেল।

সেকালে ব্রাহ্মণেরা ভিক্ষা করে সংসার চালাতেন। একদিন কৌশিক ভিক্ষা করতে এক গ্রামে গেলেন। সেখানে এক বাড়ীতে তিনি ভিক্ষা চাইলেন। সে বাড়ীর গৃহস্থ-বৌ তাঁকে বসতে বলে বাড়ীর ভেতরে চলে গেলেন। এমন সময় তার স্বামী গৃহস্থ সারাদিন পরিশ্রম করার পর ক্লান্ত হয়ে বাড়ী ফিরলেন। তিনি তাড়াতাড়ি তার স্বামীর খাবারের ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করলেন। এরপর তিনি ভিক্ষা নিয়ে কৌশিকের কাছে এলেন।

এদিকে কৌশিক অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। ক্রমশঃ তাঁর রাগ বাড়তে লাগল। গৃহস্থ-বৌকে দেরীতে ভিক্ষা নিয়ে আসতে দেখে তিনি রেগে জ্বলে উঠলেন। গৃহস্থ-বৌ ক্ষমা চেয়ে বললেন, আমার স্বামী ক্লান্তও ক্ষুধার্ত হয়ে বাড়ী ফিরেছেন। তাঁর সেবায় ব্যস্ত ছিলাম বলে আমি এতক্ষণ আসতে পারিনি। আপনি এজন্য আমার অপরাধ নেবেন না। গৃহস্থ-বৌর কথা শুনে কৌশিক খুব রেগে গিয়ে বললেন, “জান, আমি ইচ্ছা করলে তোমার অনেক ক্ষতি করতে পারি ? আমার শক্তি দেখে দেবরাজ ইন্দ্র পর্যন্ত আমাকে ভয় করেন।”

কৌশিকের কথা শুনে গৃহস্থ-বৌ বললেন, “জানি, ব্রাহ্মণ-সেবা করা আমার একান্ত উচিত। কিন্তু মনে রাখবেন, স্ত্রীর কাছে সবার আগে স্বামী, পরে ব্রাহ্মণ বা দেবতা। তাই আমি স্বামীর সেবায় এতক্ষণ ব্যস্ত ছিলাম। স্বামীর সেবার চেয়ে বড় কাজ স্ত্রীর কাছে আর কিছুই নেই”। একথা শুনে কৌশিক উত্তেজিত হয়ে বললেন, “মুর্খ নারী, তুমি কি জান না তপস্বী ব্রাহ্মণের রাগ সব কিছু ভস্ম করতে পারে ?” কৌশিকের কথা শুনে গৃহস্থ-বৌ একটুও ভয় না পেয়ে বললেন, “সামান্য একটা বককে ভস্ম করে আপনি অহঙ্কার করছেন। আপনি ভেবেছেন আমাকেও ভস্ম করবেন। কিন্তু আপনি সেটা পারবেন না। আপনি জেনে রাখুন, সতী নারীর তেজ কোন ব্রাহ্মণের

তেজের চেয়ে কম নয়। হে ব্রাহ্মণ, প্রকৃত ধর্ম সম্বন্ধে আপনি কিছুই জানেন না, ক্ষমা ব্রাহ্মণের লক্ষণ। যিনি রাগকে জয় করে ক্ষমা করতে জানেন, তিনি-ই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। আপনি মিথিলায় গিয়ে ধর্মব্যাধের কাছ থেকে উপদেশ নিন।" একথা শুনে কৌশিকের রাগ কমল। তিনি কিছুক্ষণ পরে ধর্মব্যাধের সঙ্গে দেখা করার জন্য মিথিলার দিকে রওনা হলেন।

মিথিলা এসে কৌশিক ধর্মব্যাধের ঠিকানা খোঁজ করে তার সঙ্গে দেখা করলেন। তিনি দেখলেন একটি মাংসের দোকানে বসে ধর্মব্যাধ হরিণ ও মোষের মাংস বিক্রী করছে।

কৌশিককে দেখে ধর্মব্যাধ নমস্কার করে বললেন, "প্রভু, আপনাকে দেখে মনে হয় একজন সতী স্ত্রী আপনাকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন। আপনি আমার ঘরে চলুন,

সেখানে ধর্ম সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে আলোচনা করব।" কৌশিক ধর্মব্যাধের সঙ্গে তাঁর বাড়ী গেলেন। তিনি সেখানে গিয়ে ধর্মব্যাধকে বললেন, "ধর্মব্যাধ শুনেছি তুমি খুব ধার্মিক। ধর্ম সম্বন্ধে তোমার খুব জ্ঞান, কিন্তু ধার্মিক হয়েও তুমি দোকানে বসে মাংস বিক্রী করছো কেন?" কৌশিকের প্রশ্নের উত্তরে ধর্মব্যাধ বললেন, "আমি একজন ব্যাধ। মাংস বিক্রয় করা আমার পেশা। আমি প্রাণিহত্যা করি না। অন্য লোকে প্রাণিহত্যা করে এনে দেয়। আমি তার মাংস বিক্রী করি। আমি আমার কর্তব্য করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করি"।

কৌশিক ধর্মব্যাধকে জিজ্ঞেস করলেন, তা কি রকম?

ধর্মব্যাধ বললেন, আমি সদা সত্য কথা বলি, কাউকে হিংসা করি না। সাধ্যমত দানধ্যান ও পরের উপকার করি। আমি বৃদ্ধ পিতামাতার সেবা করি। পিতামাতাকে

আমি সাক্ষাৎ দেবতা বলে মনে করি। আমি কখনও তাঁদের মনে দুঃখ দিই না। তাঁদের অনুমতি ছাড়া কখনও কোন কাজ করি না।

কৌশিক ধর্মব্যাধের কথা শুনতে শুনতে আনমনা হয়ে পড়লেন। ধর্মব্যাধ সেটা বুঝতে পেরে কৌশিককে বললেন, "হে ব্রাহ্মণ, আপনি তাপস বলে গর্ব করেন। আপনি আপনার পরমগুরু পিতামাতাকে সম্মান না করে বরং অবজ্ঞা করেছেন। আপনি তাঁদের অনুমতি ছাড়াই গৃহ ত্যাগ করেছেন। এতে তাঁরা মনে ব্যথা পেয়েছেন। আপনার অবর্তমানে সব সময় কাঁদার ফলে তাঁহারা অন্ধ হয়ে গিয়েছেন। আপনি যদি মঙ্গল চান, এখনই দেশে ফিরে যান এবং মনেপ্রাণে তাদের সেবা করুন।"

মনে রাখবেন, পিতা-মাতাই ধর্ম, পিতামাতাই দেবতা। তাঁরা সন্তুষ্ট হলে দেবতারাও সন্তুষ্ট হন। ধর্মব্যাধের কথা শুনে কৌশিক নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। তিনি ধর্মব্যাধকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা ধর্মব্যাধ, তুমি এত জ্ঞানী হওয়া সত্বেও ব্যাধ হয়ে জন্মেছ কেন? এর কারণ কি?'

ধর্মব্যাধ বললেন, আমি পূর্ব জন্মে ব্রাহ্মণ ছিলাম। আমার বন্ধু ছিলেন এক রাজা। একবার তার সাথে শিকারে গিয়ে ভুলক্রমে এক মুনিকে তীর দিয়ে আঘাত করি। তাঁরই অভিশাপে ব্যাধ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছি।

ধর্মব্যাধের কথা শুনে কৌশিক বাড়ী ফিরে গিয়ে তাঁর পিতামাতার সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করলেন। তিনি তখন বুঝতে পারলেন পিতামাতাই পরম গুরু, পিতামাতাই সাক্ষাৎ দেবতা।

অনুশীলনী

১। কৌশিক কে ছিলেন? তপস্যা বলে তিনি কোন্ অলৌকিক শক্তি লাভ করেন?
২। গৃহস্থ-বৌ ও কৌশিকের কথাবার্তা নিজের ভাষায় বল।
৩। গৃহস্থ-বৌ কৌশিককে ধর্মশিক্ষা লাভ করার জন্য কোথায় যেতে বলেছিলেন?
৪। ধর্মব্যাধের উপদেশ শুনে কৌশিক তাঁর নিজের ভুল বুঝতে পেরে কি করেছিলেন?
৫। পিতা-মাতাকে সাক্ষাৎ দেবতা বলা হয় কেন?
৬। শূন্যস্থান পূরণ কর:
(ক) সেকালে — ভিক্ষা করে — চালাতেন।
(খ) কৌশিক ছিলেন একজন —।
(গ) পিতামাতাই — পিতামাতাই —।
৭। শুদ্ধ করে লেখ:
(ক) ক্ষমা ব্রাহ্মণের / ক্ষত্রিয়ের লক্ষণ।
(খ) ধর্মব্যাধ পূর্ব জন্মে ব্যাধ / ব্রাহ্মণ ছিলেন।

দানবীর শিবি রাজার কথা

সেকালে শিবি নামে এক পরম দয়ালু রাজা ছিলেন। তিনি ধীর-স্বভাব, তপস্বী ও দাতা ছিলেন। শুধু মানুষের নয়, সর্ব জীবের আশ্রয়দাতা ও রক্ষাকারী ছিলেন তিনি। পরোপকার, যাগযজ্ঞ ও দানধ্যানের জন্য তাঁর সুখ্যাতি ত্রিভুবন ছড়িয়ে পড়েছিল।

এতে স্বর্গের দেবতারা খুব চিন্তিত হলেন। তাঁরা ভাবলেন দানের পুণ্যফলে হয়তঃ শিবি রাজা একদিন স্বর্গরাজ্য অধিকার করে ফেলেবে। তাঁরা ঠিক করলেন পৃথিবীতে গিয়ে শিবি রাজাকে পরীক্ষা করবেন।

একদিন ধর্মরাজ কপোতের রূপ ধারণ করলেন, আর ইন্দ্র ধারণ করলেন শ্যেণ পাখীর রূপ। আগে চলল কপোত আর তার পেছনে তাড়া করে চলল শ্যেণ পাখী। শ্যেণ পাখী এমন ভাব দেখাল যেন সে খুব ক্ষুধার্ত, কপোতকে খেয়ে সে তার ক্ষুধা মিটাবে।

শিবি রাজা তখন পাত্রমিত্র ও সভাসদ সহ রাজ সভায় বসেছিলেন।

তিনি তাদের সঙ্গে ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করছেন। এমন সময় কপোতটি তাঁর কোলে এসে পড়ল। আর তার পেছনে ঝড়ের বেগে শ্যেণ পাখীটি এসেও সেখানে হাজির হল।

শ্যেণরূপী ইন্দ্র শিবি রাজাকে বললেন, মহারাজ আমি খুব ক্ষুধার্ত, আপনি শীঘ্র আমার খাদ্য কপোতকে ছেড়ে দিন। দেরী হলে ক্ষুধায় আমার প্রাণ যাবে।

কপোতরূপী ধর্ম্মরাজ তখন বললেন, মহারাজ আমি এক দুর্বল ছোট পাখী। আমি প্রাণভয়ে আপনার আশ্রয় নিয়েছি। আপনি দয়া করে আমার প্রাণ রক্ষা করুন। আপনি ধার্মিক। আপনি জানেন জীবের প্রাণ রক্ষা করার চেয়ে বড় ধর্ম কিছু নেই।

শিবিরাজা কপোতকে অভয় দিয়ে বললেন, তোমার কোন ভয় নেই। আমি তোমাকে শ্যেণ পাখীর হাত থেকে যে ভাবেই হোক রক্ষা করব।

তারপর তিনি শ্যেণ পাখীকে বললেন, তুমি কপোতকে পাবে না। তার বদলে তোমাকে আমি ছাগল, হরিণ, মোষ যা চাও তাই দেব। কিন্তু আমার আশ্রয়প্রার্থী কপোতকে কিছুতেই দেব না।

রাজার কথা শুনে শ্যেণ পাখী বলল, মহারাজ আমি কপোতের মাংস ছাড়া অন্য কোন মাংস খাই না। আপনি তাড়াতাড়ি কপোতকে ছেড়ে দিন। বেশী দেরী করলে আমার মৃত্যু ঘটবে। আমার মৃত্যু হলে আমার স্ত্রী-পুত্র খাদ্যের অভাবে মারা যাবে। আপনি একজনকে বাঁচাতে গিয়ে অনেকের মৃত্যুর জন্য দায়ী হবেন। আপনার তাতে পাপ হবে।

শিবি রাজা বললেন, আমার যত পাপই হোক, আমি কপোতকে ছাড়ব না। কপোতটির প্রাণের বিনিময়ে আমি আমার সমস্ত রাজ্য ছেড়ে দিচ্ছি। তুমি ওসব নিয়ে তার প্রাণ রক্ষা কর।

রাজার কথার উত্তরে শ্যেণপাখী বলল, মহারাজ আমি ক্ষুধার্ত, আপনার রাজ্য নিয়ে আমি কি করব। নিতান্তই যদি কপোতকে বাঁচাতে চান তবে কপোতের সমান ওজনের মাংস আপনার শরীর থেকে এক্ষুনি আমায় দিন।

রাজা শিবি বিনা দ্বিধায় রাজী হয়ে গেলেন। নিজের দেহের মাংস দিয়ে যদি শরণাগতের প্রাণরক্ষা হয়, তাতে রাজার আক্ষেপ নেই। রাজা একটা তুলাদণ্ড এনে এক পাল্লায় কপোতকে রাখলেন আর অন্য পাল্লাটিতে নিজের শরীর থেকে মাংস কেটে রাখতে লাগলেন। কিন্তু যতই মাংস কেটে দেন কিছুতেই কপোতের সমান ওজন আর হয় না, ওজনে কপোতই অধিক ভারী হল। অবশেষে রাজা শিবি ভগবানকে স্মরণ করে নিজেই তুলাদণ্ডে উঠে বসলেন। তখন আকাশ-বাতাস, সাধু সাধু রবে মুখরিত হল। তখন ইন্দ্র নিজরূপ ধারন করে রাজাকে পরীক্ষা করার কথা বললেন। তিনি রাজার দানশীলতার প্রশংসা করে বললেন, “যতদিন পৃথিবীতে মানুষ থাকবে ততদিন রাজা শিবির-অসামান্য দানের কথা সবাই প্রসংসা করবে।”

শিবিরাজার এই অপূর্ব আত্মত্যাগে মুগ্ধ হয়ে ধর্ম ও ইন্দ্র তাঁকে অনেক বর দিলেন। মানুষ অন্যের মঙ্গলের জন্য ধনদৌলত বিষয়-আশয় দান করে থাকে।

কিন্তু অন্যের মঙ্গলের জন্য নিজের প্রাণত্যাগের মতো মহত্ব আর কিছুতেই নেই। জীবের প্রাণরক্ষা করাই সবচেয়ে বড় ধর্ম।

অনুশীলনী

১। রাজা শিবি কিরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন ?

২। শিবি রাজার খ্যাতি কি জন্য বিখ্যাত ছিল ?

৩। শিবি রাজাকে যাঁরা পরীক্ষা করতে এসেছিলেন তাঁরা কিভাবে শিবি রাজাকে পরীক্ষা করলেন ?

৪। মানুষের সবচেয়ে বড় ধর্ম কি ?

৫। নীচের শব্দগুলি দ্বারা এক-একটি বাক্য রচনা কর ঃ—
কপোত, দয়ালু, আশ্রয়, আরোহণ, দান, রাজা।

৬। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ
(ক) শিবি রাজা — ছিলেন।
(খ) ধর্মরাজ — রূপ ধারন করলেন, ইন্দ্র ধারন করলেন — রূপ।
(গ) জীবের — করাই সবচেয়ে বড় —।

মরা ইঁদুর লাখ টাকা

অনেকদিন আগের কথা বারানসী নগরে বোধিসত্ত্ব নামে একজন লোক বাস করতেন। তিনি শ্রেষ্ঠি বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন ভাল গণনাকারী ছিলেন। তিনি 'চুল্ল শ্রেষ্ঠ' উপাধি লাভ করেন।

একদিন তিনি রাজবাড়ীতে রওয়ানা হয়েছেন, এমন সময় পথে একটি মরা ইঁদুর দেখতে পেলেন। তিনি আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান বিচার করে বললেন, কোন বুদ্ধিমান লোক এই মরা ইঁদুরটি নিলে ওটা থেকে অনেক অর্থ লাভ করতে পারবে। তখন একজন বেকার লোক সে পথ দিয়ে যাচ্ছিল। বোধিসত্ত্বের কথাগুলি সে শুনতে পেল। সে ভাবল, ইনি একজন বিদ্বান লোক, নিশ্চয়ই জেনে-শুনে একথা

বলেছেন। তাঁর কথামতো কাজ করে দেখিনা আমার ভাগ্য ফেরে কি-না। যুবকটি তখন পথ থেকে মরা ইঁদুরটি তুলে নিল। তারপর সে একমনে পথ চলতে লাগল। কিছুদূর যেতেই এক দোকানদারের সাথে তার দেখা হল। সে তার পোষা বিড়ালের জন্য খাবার খুঁজতে ছিল। সে চার কড়ি দাম দিয়ে যুবকের কাছ থেকে মরা ইঁদুরটি কিনে নিল। যুবকটি তখন সেই অর্থ দিয়ে গুড় ও একটি কলসী কিনল। তারপর সে মালাকারদের যাতায়াতের পথে বসে রইল। বন থেকে ফুল তুলে পরিশ্রান্ত মালাকারেরা যখন বাড়ী ফিরছিল তখন সে তাদের প্রত্যেককে গুড় ও এক ওড়ং জল দিল। মালাকারেরা তৃপ্তির সাথে জল পান করে প্রত্যেকে তাকে এক মুঠো ফুল দিয়ে গেল।

যুবক সেই ফুল বিক্রী করে আরো বেশী করে গুড় কিনল এবং পরের দিন মালাকারদের গুড় ও জল খাওয়াল, মালাকারেরা সেদিন কেউ ফুল, কেউ বা ফুটন্ত ফুলের গাছ উপহার দিল। এভাবে ফুলগাছ ও ফুল বিক্রী করে সে আট কাহন জমিয়ে ফেললো।

কিছুদিন পরের কথা এক রাত্রে খুব ঝড়-বৃষ্টি হওয়ায় রাজার বাগানের অনেক গাছ ও ডালপালা ভেঙ্গে গেল। এতে বাগানের মালী খুব চিন্তিত হল। সে ভাবল এত ভাঙ্গা ডাল-পালা ও আবর্জনা সে সরাবে কেমন করে। এমন সময় সেই যুবক সে পথ দিয়ে যাচ্ছিল। সে মালীকে বলল, তুমি যদি সব ভাঙ্গাগাছ ও ডাল-পালা আমাকে দাও, তা হলে আমি বাগান থেকে সব আবর্জনা দূর করে দিতে পারি। যুবকটির কথায় মালী রাজী হল। যুবকটি দেখল কিছু দূরে কয়েকজন বালক খেলা করছে। সে তাদের কাছে গিয়ে বলল, তোমরা যদি আমার সাথে গিয়ে রাজার বাগানের আবর্জনা দূর করে দাও, তবে আমি তোমাদের খাবার জন্য প্রত্যেককে সুস্বাদু গুড় দেব। গুড়ের লোভে বালকেরা আনন্দে হৈ-হৈ করে রাজার বাগানের সব ভাঙ্গা গাছ ও ডাল-পালা এনে রাস্তার উপর স্তূপ করল।

এদিকে তখন রাজবাড়ীর কুমোর বেড় হয়েছে কাঠ কিনবার জন্য। সে যুবকটির কাছ থেকে ষোল কাহন ও কয়েকটি হাড়ি দিয়ে সেসব ডাল-পালা কিনে নিল। যুবকটি সেই অর্থ দিয়ে কয়েকটি বড় জালা কিনল। সে সময় বারানসীতে পাঁচশ ঘেসেরা বাস করত। তারা রোজ ঘাস কাটার জন্য শহরের বাইরে যেত। যুবকটি শহরের বাইরে এক জায়গায় জল দিয়ে জালা ভরে রাখল। ঘেসেরেরা ঘাস কাটতে কাটতে তৃষ্ণার্ত হলে সে তাদের জলপান করতে দিত। এতে ঘেসেরেরা খুশী হয়ে তাকে কিছু উপহার দিতে চাইলে যুবকটি বলল, যখন প্রয়োজন হবে তখন সে নিজেই চেয়ে নেবে।

কিছুদিন পরে যুবকটি জানতে পারল একজন ঘোড়াওয়ালা পাঁচশ ঘোড়া নিয়ে শহরে বিক্রী করতে আসবে। তখন সে ঘেসেরাদের কাছে গিয়ে বলল, ভাই, তোমরা প্রত্যেকে আমাকে একআঁটি করে ঘাস দেবে এবং আমার ঘাস বিক্রী না হওয়া পর্যন্ত কেউ ঘাস বিক্রী করতে পারবে না। ঘেসেরারা এতে রাজী হল। পরদিন সেই ঘোড়াওয়ালা শহরে আসল। সে কোথাও ঘাস না পেয়ে যুবকের কাছে এল। সে তার কাছ থেকে এক হাজার কাহন দিয়ে পাঁচশ আঁটি ঘাস কিনে নিল।

আরো কিছুদিন পরে যুবকটি খবর পেল একটি মাল-বোঝাই জাহাজ বন্দরে আসছে। সে তখন তাড়াতাড়ি সেখানে হাজির হল। তার কাছে তখন অর্থ ছিল না। হাতে নাম লেখা একটি আংটি মাত্র ছিল। চট করে তার মাথায় একটি বুদ্ধি খেলল। সে আংটিটি দিয়ে জাহাজের সব মাল বায়না করে ফেলল। তারপর সে সেখানে তাঁবু খাঁটিয়ে বাস করতে লাগল। সে কয়েকজন আর্দালি রেখে তাদের আদেশ দিল

কোন বণিক তার সাথে দেখা করতে আসলে পর-পর তাদের সাথে দেখা করে যেন পরে ভিতরে আসে।

এদিকে বন্দরে মাল-বোঝাই জাহাজ আসার খবর পেয়ে বণিকের দল সেখানে এসে হাজির হল। তারা সবাই মাল কেনার জন্য ব্যস্ত। তারা যুবকটির তাঁবুর জাঁকজমক ও আর্দালিদের ঘটা দেখে খুব সম্ভ্রম সহকারে তার সাথে দেখা করল। বণিকেরা প্রত্যেকে হাজার মুদ্রা লাভ দিয়ে এক-এক অংশ মাল কিনল। এভাবে মোট দুলক্ষ মুদ্রা লাভ করে যুবকটি বারানসীতে ফিরে গেল ও কৃতজ্ঞতা স্বরূপ বোধিসত্ত্বকে এক লক্ষ মুদ্রা উপহার দিল। বোধিসত্ত্ব সব কথা শুনে যুবকটির প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে নিজের মেয়ের সাথে তার বিয়ে দিলেন। বোধিসত্ত্বের কোন পুত্র ছিল না। তাঁর মৃত্যুর পর যুবকটি সমস্ত সম্পত্তির মালিক হল। কালক্রমে সে বারাণসীর মহা শ্রেষ্ঠির পদ লাভ করল।

এই গল্প থেকে তোমরা বুঝতে পারলে উদ্যম ছাড়া কারো মনোরথ পুর্ণ হয় না।

অনুশীলনী

১। বোধিসত্ত্ব কে ছিলেন? তিনি কেন বিখ্যাত ছিলেন?

২। বেকার যুবকটি কেন মরা ইঁদুরটি মাটি থেকে যত্ন করে তুলে নিয়েছিল?

৩। রাজার বাগানের মালী কেন চিন্তিত হয়েছিল? সে কিভাবে বাগানের ভাঙ্গা গাছপালা ও আবর্জনা পরিষ্কার করেছিল।

৪। ঘেসেরেরা যুবকটিকে কি দিয়েছিল এবং কেন?

৫। বেকার যুবকটি কি করে দু লক্ষ টাকার মালীক হয়েছিল।

৬। এই গল্পটি থেকে কি উপদেশ লাভ করলে?

৭। নীচের শব্দগুলি দিয়ে এক-একটি বাক্য রচনা কর :—

বেকার, গুড়, বাগান, জল, বন্দর, জাহাজ।

৮। শূন্যস্থান পূরণ কর :—

(ক) সে — কড়িদাম দিয়ে ইঁদুরটি কিনে নিল।

(খ) যুবকটির কথা — রাজী হল।

(গ) সে সময় — পাঁচশ ঘেসেরা বাস করত।

(ঘ) সে — দিয়ে জাহাজের মাল কিনে ফেলল।

(ঙ) কালক্রমে সে বারানসীর — শ্রেষ্ঠির পদ লাভ করল।

বক ও ব্রাহ্মণ

কোন এক গ্রামে গৌতম নামে এক গরীব ব্রাহ্মণ বাস করত। সে ভিক্ষা করে কোনক্রমে দিন চালাত। একদিন ভিক্ষা করতে করতে সে এক বড়লোকের বাড়ী এসে উপস্থিত হল। গৌতমকে দেখে বাড়ীর মালিক বাইরে এল। তার বড় বড় কোকড়ানো চুল, বড় বড় গোঁফ, লাল চোখ ও পোশাক দেখে অনুমান করা গেল সে একজন বড় ডাকাত।

কিন্তু লোকটি ডাকাত হলে কি হবে। তার মনটি ছিল খুব সরল। গৌতম তার ব্যবহারে খুশী হয়ে সেই বাড়ীতেই থেকে গেল। ডাকাতের বাড়ীতে থাকতে থাকতে গৌতমও কালক্রমে একজন নামকরা ডাকাত হয়ে উঠল। সে তার ধনুক হাতে নিয়ে বনে-বনে ঘুরে বেড়ায়, যাকে-তাকে হত্যা করে। গৌতম একদিন শিকার করে বাড়ী ফিরছে, পথে হঠাৎ একবন্ধুর সাথে তার দেখা হল। গৌতম বন্ধুকে জড়িয়ে ধরে বলল, বন্ধু, তুমি আমাকে চিনতে পারছ না ? আমি গৌতম। বন্ধু অবাক হয়ে তাকে বলল, তুমি ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে পশু শিকার করছ ? গৌতম বলল, ভাই সঙ্গদোষে আমার এই দশা হয়েছে আমি অচিরেই এই স্থান ছেড়ে অন্যত্র চলে যাব। আজ আমার ভুল ধরিয়ে দিয়ে তুমি প্রকৃত বন্ধুর কাজ করলে। দুই বন্ধুতে মিলে অনেক কথা হল। তারপর যে যার মত চলে গেল।

পরদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে গৌতম ভিন্ন দেশে রওনা হল। কিছুদূর যাওয়ার পর সে একটি বাগান দেখতে পেল। বাগানে ঢুকে সে একটি গাছের তলায় বসল। কিছুক্ষণ পরে তার ক্ষুধা পেল। সে গাছের উপরে একটি বক দেখতে পেয়ে ভাবল এটাকে মারতে পারলে ভাল হয়। এমন সময় বক গাছের উপর থেকে বলে উঠল, পথিক, তোমাকে দেখে মনে হয় তোমার খুব ক্ষুধা পেয়েছে। বকের কথা শুনে গৌতম বলল, হ্যাঁ, আমার ক্ষুধা পেয়েছে। বক তখন তাকে কিছু খাবার দিল। গৌতম পেট ভরে খাওয়ার পর বক তাকে ডানা দিয়ে হাওয়া দিতে লাগল। সে গৌতমকে জিজ্ঞাসা করল কেন সে বাড়ী থেকে চলে এসেছে। গৌতম বলল যে সে খুব গরীব। টাকা পয়সা রোজগারের উদ্দেশ্যে সে বাড়ী ছেড়ে চলে এসেছে। এই কথা শুনে গৌতমের প্রতি বকের মায়া হল। সে গৌতমকে বলল বিরূপাক্ষ নামে আমার এক পরম বন্ধু আছে। সে রাক্ষসদের রাজা। তার কাছে গিয়ে বলবে আপনার বন্ধু রাজধর্ম আমাকে পাঠিয়েছে। আমার কথা বললে সে তোমাকে অবশ্যই সাহায্য করবে। তোমার আর কোন অভাব থাকবে না।

পরদিন বকের কথামত গৌতম বিরূপাক্ষের নিকট উপস্থিত হল। বিরূপাক্ষ তার বন্ধুর কথা শুনে গৌতমকে প্রচুর ধনরত্ন দান করল। গৌতম সেই ধনরত্ন নিয়ে বকের কাছে ফিরে এল। বক সেদিনও গৌতমকে পেট ভরে খাওয়াল। মনের

আনন্দে গৌতম ভাবতে লাগল কাল সকালে যখন সে দেশে ফিরবে তখন তাকে অনেক পথ হাঁটতে হবে ও পথে তার অবশ্যই ক্ষুধা পাবে। এই ভেবে সে তখনই বকটিকে মেরে আগুনে ঝলসে ফেলল। পরের দিন সকালে উঠে সে ধনরত্ন ও বকের মাংস নিয়ে দেশের দিকে রওয়ানা হল।

এদিকে বিরূপাক্ষ রাজসভায় তার বন্ধু রাজধর্মকে দেখতে না পেয়ে তার ছেলেকে খোঁজ করতে বলল। বিরূপাক্ষের ছেলে খুঁজতে গিয়ে দেখল যে-গাছে রাজধর্ম বাস করত সে গাছের নীচে তার পালক ছাড়ানো রয়েছে। সে তখন বুঝতে পারল কেউ রাজধর্মকে হত্যা করেছে। সে যেয়ে তার পিতা বিরূপাক্ষকে সব কিছু বলার পর সে
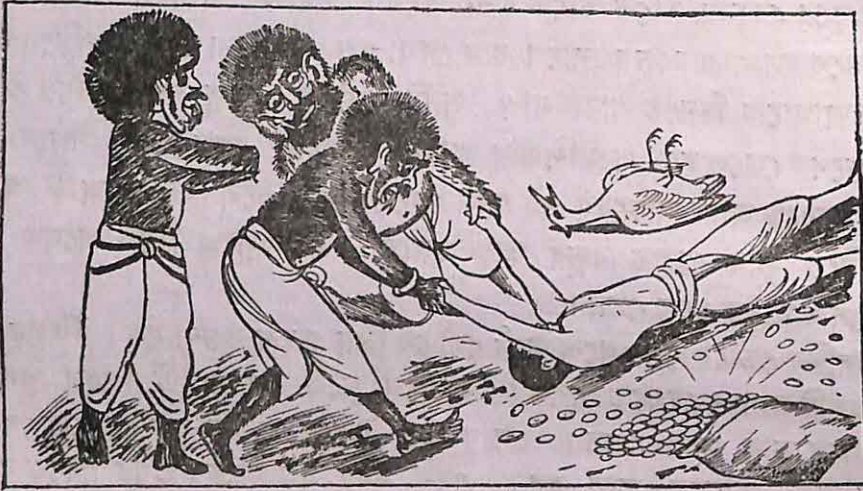
বুঝতে পারল এটা গৌতমেরই কাজ। সে তখন তার রাক্ষস অনুচরদের বলল গৌতমকে ধরে আনতে। রাক্ষসদের দল তখন হৈ হৈ রব করে রওনা হল। কিছুদূর যাওয়ার পর তারা গৌতমকে দেখতে পেল এবং তাকে তারা টানতে টানতে রাজার কাছে নিয়ে এল। রাজা গৌতমকে দেখে রেগে গেল এবং তাকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলতে আদেশ দিল। যে তার এত উপকার করল, সে কিনা তাকেই হত্যা করল। অনুচরেরা রাজার আদেশ পালন করল। অকৃতজ্ঞ গৌতমের উপযুক্ত সাজা হল।

অনুশীলনী

১। গৌতম কে? সে কি ভাবে ডাকাতের পাল্লায় পড়েছিল?

২। বক কিরূপ প্রকৃতির ছিল? সে গৌতমের জন্য কি করেছিল?

৩। গৌতমকে অকৃতজ্ঞ বলার কারণ কি? সে শেষ-পর্যন্ত বকের সাথে কি রূপ ব্যবহার করেছিল?

সত্যের জয়

হজরত আবদুল কাদের জিলানী একজন বিখ্যাত তাপস ছিলেন। সত্যবাদিতার জন্য তিনি বিখ্যাত ছিলেন।

সত্যকথা বলতে তিনি কখনও ভয় পেতেন না। আজ তোমাদের তাঁর সত্যবাদিতা সম্বন্ধে একটি সুন্দর গল্প বলব এবং সেই গল্প শুনলে তোমরা বুঝতে পারবে সত্য কথা বলার মূল্য কত বেশী।

হজরত আবদুল কাদের জিলানী তখন সবে মাত্র বালক। বিদ্যাশিক্ষার জন্য তিনি একদল বণিকের সাথে বাগ্‌দাদ শহরে যাচ্ছিলেন। পড়ার খরচের জন্য তাঁর মা তাঁর জামার আস্তিনের মধ্যে কয়েকটি টাকা সেলাই করে দিয়েছিলেন। তিনি ছেলেকে যাওয়ার সময় উপদেশ দিয়েছিলেন সে যেন সত্য কথা বলতে কখনও ভয় না পায়। কিছু দূর যাওয়ার পর পথে একদল ডাকাতের সাথে আবদুল কাদেরের দেখা হল। ডাকাতদের একজন তাকে জিজ্ঞেস করল, বালক, তোমার কাছে কি আছে?

বালক ভয় না পেয়ে উত্তর দিল, আমার কাছে টাকা আছে। কয়েকজন ডাকাত বালকের পুঁটুলি ও জামা খুঁজে কিছুই পেল না। তখন তারা খুব রেগে গিয়ে বলল, আমাদের সাথে তামাসা করছ বুঝি! কোথায় তোমার টাকা? বালক বলল, তামাসা নয়, সত্যিই আমার কাছে টাকা আছে। অবশেষে ডাকাতেরা বালকটিকে তাদের সর্দারের কাছে নিয়ে গিয়ে বলল, হুজুর, এই বালকটি বলছে, তার কাছে টাকা আছে। কিন্তু অনেক খুঁজেও তার কাছে আমরা কিছুই পাচ্ছিনা। আপনি এখন তাকে জিজ্ঞেস করুন।

সর্দার বালকটিকে জিজ্ঞেস করল, "কোথায় তোমার টাকা আছে বল।" বালক বলল, টাকা আমার জামার আস্তিনের মধ্যে সেলাই করা আছে। সর্দারের আদেশে একজন ডাকাত বালকের জামার আস্তিন খুঁজে দেখল তার ভিতর সত্যই টাকা আছে। বালকের এমন সত্য কথায় ডাকাতদল অবাক হয়ে গেল। ডাকাতদের সর্দারও বিস্ময় প্রকাশ করে বালককে জিজ্ঞেস করল, তুমি টাকার কথা বললে কেন? তুমি না বললে আমরা তো টাকার কথা কিছুই জানতে পারতাম না।

বালক বলল, আমি মিথ্যা কথা বলব কেন? বাড়ী থেকে আসার সময় মা আমাকে বলে দিয়েছেন আমি যেন কখনও সত্যকথা বলতে ভয় না পাই। আমি কয়েকটি টাকার জন্য মায়ের কথা অমান্য করতে পারব না।

বালকের সত্য কথায় সর্দারের জ্ঞানচক্ষু খুলে গেল। সে কিছুক্ষণ চিন্তা করতে লাগল। তারপর সে ডাকাতদের বলল, দেখ, সামান্য বালক পর্যন্ত মায়ের আদেশ পালন করে বিপদেও সত্য কথা বলছে, আর আমরা ভগবানের আদেশ অমান্য করে অনবরত পাপ কাজ করছি।

আমাদের এই কাজের ফলে কত লোকের সর্বনাশ হচ্ছে। এখন থেকে স্থির করেছি আমরা আর এই পাপ কাজ করবো না।

সেই দিন থেকে ডাকাতের দল পাপের পথ ছেড়ে সৎপথে চলতে লাগল। সত্যের কী অপার মহিমা।

অনুশীলনী

১। আবদুল কাদের কিরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন?

২। কাদেরের মা কাদেরকে কি বলে দিয়েছিলেন? কাদের দস্যুর হাতে পড়েও কি ভাবে রক্ষা পেল?

৩। দস্যু সরদার দস্যুদের কি বলেছিল?

৪। কখন থেকে ডাকাতের দল সৎপথে চলতে লাগল?

৫। শূন্যস্থান পূরণ কর :—

(ক) আবদুল কাদের — বালক ছিলেন।

(খ) একদল — সাথে আবদুল কাদেরের দেখা হল।

(গ) বালক বলল, 'আমি — কথা বলব কেন'।

(ঘ) বালকের — কথায় — জ্ঞানচক্ষু খুলে গেল।

(ঙ) সেই দিন থেকে — দল পাপের পথ ছেড়ে — চলতে লাগল।

(চ) সত্যের — হবেই।

৬। নীচের শব্দগুলি দিয়ে এক একটি বাক্য রচনা কর :—

জয়, বিখ্যাত, তাপস, ডাকাত, তামাসা, কোথায়, অবাক, বিস্ময়, অমান্য, আদেশ, স্থির।